বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস

কার্তিক লাহিড়ী



সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী : : কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাভাজন গণেশচন্দ্র রায়
প্রিয়ভাজন সুরজিৎ বসু

বাস্তবতা ও উপন্যাস

উচ্চমানের উপন্যাস এবং উপন্যাস-তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার অভাব আমাদের সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। কান্তিবিদ্যা বা সমালোচনা শাস্ত্র সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অনুগ ব'লে সিদ্ধান্ত করা অনুচিত নয় যে, উচ্চমান উপন্যাসের অনটনের দরুন বাংলা উপন্যাস-বিষয়ক চর্চার দৈন্যদশা। আমাদের উপন্যাসের প্রধান পুরুষেরা উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় যথেষ্ট কৃপণ ছিলেন, ইতস্তত কিছু মন্তব্য অথবা পুস্তক সমালোচনায় প্রাপ্ত তাঁদের অভিমত ক্রম অনুসারে গ্রথিত করলে তার গুণ ও পরিমাণ কাব্য ও নাটকালোচনার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, এবং সে অভিমতগুলিও সর্বদা সুচিন্তিত এবং সংহত —এমন কথা গলা বাড়িয়ে বলা অসম্ভব ; যদিও "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় উপন্যাসগ্রন্থ সমালোচনার কোন কোন ক্ষেত্রে বা রবীন্দ্রনাথের দু-একটি প্রবন্ধে ঔপন্যাসিক সজাগমনস্কতার পরিচয় দুর্লভ নয়। উপন্যাসের শিল্প-তত্ত্ব ও স্বরূপ, ঔপন্যাসিকের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রকাশের তাগিদ যে শিল্পীর সচেতন প্রয়াসেরই অন্তর্গত এসব আলোচনায় সেই বিষয়গুলি প্রায় সম্পূর্ণ অনুদ্‌ঘাটিত থাকে। এগুলি উপন্যাস আলোচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবেই বিবেচ্য।

তবু উপন্যাস যে প্রকৃত শিল্পকর্ম—এই বোধ যা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় প্রকট না হ'লেও বর্তমান, আমাদের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তা শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত। তাঁদের কাছে নিছক গল্প এবং গল্প বলাই উপন্যাসের চরম ও পরম লক্ষ্য, তাই আজও পাঠকের কাছে উপন্যাস কাব্য ও নাটকের তুলনায় হেলা-ফেলার

বস্তু, আজও উপন্যাস পাঠকের নিদ্রাকর্ষণের মহৌষধরূপে বিবেচিত। কিন্তু প্রকৃত শিল্প নিদ্রাহরণকারী, তার মর্মোদ্ধারের জন্য প্রয়োজন অভিনিবেশ। উপন্যাস সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অর্বাচীন, সেজন্য হয়ত এর যথার্থ মুল্যায়ন বর্তমানে সম্ভব নয়, অথবা উপন্যাসের স্বরূপ সম্পর্কে লেখক পাঠকের ধারণা এখনও অস্পষ্ট কুয়াশাবৃত, অথবা উভয়পক্ষের জাড্যই এর মূল কারণ; তবু আমরা ধীরে ধীরে এ বিষয়ে সচেতন হতে বাধ্য যে, উপন্যাস আমাদের তরল লঘুচপল আমোদ-প্রমোদ কণ্ডূয়নের মাধ্যম নয়, পৃথিবীর রথী মহারথীগণের সফল উপন্যাস এমনকি তাঁদের নিকৃষ্ট উপন্যাসে একটি কথা পরিষ্কার হয় যে, উপন্যাস জীবনের সমস্যাবলী ও জীবন-সামগ্র্য রূপায়ণের শিল্প-কথা।

উপন্যাসই একমাত্র শিল্প যার উপজীব্য গোটা ব্যক্তিমানুষ, সেই জীবনের সর্বাত্মক রূপায়ণ, এবং এই জীবন শান্ত সমাহিত বা আবহমানতায় পরিপূর্ণ নয়, কারণ উপন্যাসের জন্ম হয়েছে মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তা ও বোধ জাগার পর। এই বোধের ফলে আগের মানুষের মত সে আর শুধুমাত্র সমাজপালিত বাধ্য জীব নয়, কারণ ততক্ষণে তার চাওয়া-পাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক শাসন অনুশাসনের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে, অবশ্য আগেকার সমাজেও কিছু কিছু মানুষ ব্যক্তিতাবাদী ছিল সন্দেহ নেই, কারণ তখনও কিছু লোক অহংকেন্দ্রিক, বিশিষ্ট এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় অবিশ্বাসী ছিল; কিন্তু প্রাতিস্বিকতাবোধ এমন উপরিতলের ব্যাপার নয়, এই বোধে নিহিত থাকে যে সমাজ পরিচালিত হয় ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা অনুসারে, যে ব্যক্তি কিনা একই সঙ্গে অন্য মানুষ এবং অতীতের ধ্যান-ধারণা থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। (এ প্রসঙ্গে ইআন ওআট-এর রাইজ অব দি নভেল গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য) ফলে প্রাতিস্বিক

মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সংঘর্ষের দ্বন্দ্বের, অথচ এই সংঘর্ষ নাটকীয় নয় সর্বদা, তার তুলনা চলে বোধহয় বর্তমানের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে, যে লড়াই-এ স্নায়ু টান টান ও উত্তেজিত হ'লেও উপরে থাকে স্বাভাবিকতার আচ্ছাদন। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক দ্বন্দ্ব সংঘাতের হ'লেও সেই দ্বন্দ্ব সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ নেই সর্বদা, অনেকটা ফল্গুর মত সেই সম্পর্ক তলে তলে ঊর্মিমুখর কিন্তু উপরে প্রায় নিরীহ।

অন্যপক্ষে ব্যক্তিমানুষ সামাজিক হ'লেও তার আত্মমর্যাদাজ্ঞান প্রখর, এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের গরজও বেশী, ফলে তার আত্মপ্রতিফলনের তীব্রতা ও আবেগে আত্মপ্রকাশের আকৃতি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, যদিও এই আকৃতি-তে ব্যক্তির অন্তরজীবন অত্যন্ত শুদ্ধভাবে প্রকাশিত হ'লেও কর্মমুখর ব্যক্তির অন্য অস্তিত্ব তার চলা-ফেরা জীবন ধারণের সামগ্রিক কাণ্ড কারখানা ধরা পড়ে না সহজে, সেজন্য নাটক বা কবিতার মত ঘটনার বা অনুভূতির শীর্ষবিন্দু বা সংকট মুহূর্ত ঔপন্যাসিকের একমাত্র কেন্দ্র বা কেন্দ্রবিন্দু নয়, ক্রমোন্নতি ও বিকাশের মাধ্যমে জীবনের সমগ্র রূপ শিল্পায়িত করাই তাঁর লক্ষ্য, এবং এখানেই উপন্যাস নাটক এবং কবিতা থেকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত শিল্প। একমাত্র উপন্যাসেই মানুষের গোচর-অগোচর বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ ব্যক্ত-অব্যক্ত জীবন উদ্ভাসিত হয়। জীবনকে অ-প্রতিরোধে মেনে নিয়ে নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও সমালোচনার মনোভাবে যাচাই ক'রে জীবনের সমগ্রতা তুলে ধরার প্রচেষ্টায় উপন্যাসের উদ্ভব, ফলে উপন্যাসে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে জীবন বিচারের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণমূলক প্রণালীর আশ্রয় নিতে বাধ্য। কবিতার আত্মপ্রতিফলনের আত্মমুখীতা বা নাটকের বহিরঙ্গ রূপায়ণের প্রণালীর কোনটাই

এক্ষেত্রে উপযুক্ত নয় এককভাবে, একমাত্র বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণমূলক প্রণালীতে নৈব্যক্তিকতায় গোচর অগোচর জীবনের তাবৎ কর্মকাণ্ড স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হয় প্রণালীর স্বগুণেই। অবশ্য সামগ্রিক ঐক্য স্থাপনে বিশ্লেষণমূলক প্রণালী কার্যকারী কিনা—এ বিষয়ে সংশয় জাগা স্বাভাবিক, কারণ বিশ্লেষণে শব ব্যবচ্ছেদের মত বিভিন্ন শরীরস্থানের হদিশ মিললেও প্রাণের অস্তিত্ব মেলা অসম্ভব, যদিও অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের মধ্যেই প্রাণের স্পন্দন নিহিত। তেমন প্রাণহীন দেহে উপন্যাসের পরিণতি সম্পর্কে আশঙ্কা জাগা অমূলক নয়।

কিন্তু একটি মাত্র খুঁটির জোরে উপন্যাস অনন্ত ভবিষ্যৎময় একটি অপূর্ব শিল্পরূপ, সেই খুঁটির নাম বাস্তবতা। অবশ্য বাস্তবের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক ; "বাস্তবতা", টমাস হার্ডির ভাষায়, "একটি অভাগা দ্ব্যর্থ্যবোধক শব্দ, যা সাহিত্যিক সমাজের কাছে মজাদার দৃশ্য দেখার মত ব্যাপার, যা কোন কোন ক্ষেত্রে নকল কবার, কোন ক্ষেত্রে যৌন কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।" (মিরিঅম এ্যালট-এর নভেলিস্ট অন দি নভেল গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৪)। সেজন্য বাস্তবের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ স্থৈর্য থাকা দরকার। দুঃখের বিষয় আমরা মজ্জায় মজ্জায় ভাবালু ও মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতর, সেজন্যে সামান্য ধৈর্যের বিনিময়ে উপরিতলের আলোড়নই আমাদের কাছে বাস্তবরূপে প্রতিভাত হয়, যেন বাস্তব ছন্নছাড়া কারণহীন স্বয়ম্ভু একটা স্বতঃপ্রকাশ। তাই ঘটনা চরিত্রের প্রাথমিক স্তর-ই আমাদের কাছে বাস্তব জ্ঞানের সীমা হয়ে থাকে ; বহু সময় ঘটনা, পরিস্থিতি বা পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাকে আমরা বাস্তবতা ভাবতে অভ্যস্ত। যদিও এ-প্রণালীতে বাস্তবকে তুলে ধরার চেষ্টা কোন কোন অসাধারণ বা বিশেষ মুহূর্ত ও অবস্থায় কার্যকরী হয়, কিন্তু জগতে সমস্ত ঘটনা তুল্যমূল্য নয়, আর

এইখানেই পার্থক্য দেখা দেয় যথাযথবাদের (Naturalism) সঙ্গে বাস্তববাদের (Realism)।

সমস্ত ঘটনা তুল্যমূল্য হওয়ার ফলে যথাযথবাদীরা অচিরেই পরিবেশবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েন, যদিও তাঁরা আন্তরিকভাবেই বাস্তবকে তুলে ধরতে চান। যথাযথবাদে প্রতিমূর্তি রচনার প্রতি সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ব'লে ঐ রীতিতে নির্বাচনের প্রশ্ন হয়ে পড়ে অবান্তর, ফলে মানুষের সৃষ্টিশীল ভূমিকা সেখানে সহজে গোচরে আসে না; ঠিক ততখানি নির্বাচন তাঁরা সময় সময় সমর্থন করেন, যে নির্বাচনে সন্নিহিত বর্তমান বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। এই নির্বাচনের অভাবে আপাত বাস্তব উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও প্রকৃত বাস্তব ততই দূরে সরে যায়, কারণ জীবন ও শিল্পের মধ্যে দূরত্ব আছে, ঐ দূরত্ব মোচন শিল্পীর উদ্দেশ্য, কিন্তু মাত্র প্রতিমূর্তি রচনায় সেই দূরত্ব মোচন সম্ভব নয়। প্রতিমূর্তি হচ্ছে নিশ্চল এবং জড়, অথচ জীবন কেবলই চলিষ্ণু ও বিকাশোন্মুখ, ফলে একটি স্থির চিত্র দিয়ে চলমান চিত্রকে ধরা প্রায় অসম্ভব।

অন্যপক্ষে বাস্তববাদে সমস্ত ঘটনা তুল্যমূল্য নয় ব'লে সেখানে নির্বাচন জরুরি হয়ে পড়ে, বাস্তববাদীর কাছে সেই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ যা পরবর্তী সময়ে বা পরবর্তী ঘটনাকে প্রভাবিত করে। এই নির্বাচনে শিল্পীর তত্ত্ববিশ্বও সক্রিয় থাকে ব'লে সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে লেখক জীবনসামগ্র্য তুলে ধরেন অনায়াসে, 'অন্যদিকে সামগ্রিক তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত বর্ণনা-রাশির দ্বারা সৃষ্টির প্রেরণাকে সীমিত করার জন্য প্রাকৃতিকবাদকে ব্যবহার করা হয়।' (লুই আরাগঁ, নতুন চোখে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ, পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৬৬)। বাস্তববাদকে তেমন ব্যবহার করার সুযোগ নেই, কারণ সেখানে খুঁটিনাটির বর্ণনা সামগ্রিক তাৎপর্য থেকে বিযুক্ত নয় এবং 'বাস্তববাদী

শিল্পকলা খণ্ড খণ্ড বস্তুসত্যকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে কিন্তু অ-বাস্তববাদী শিল্প তা করতে নারাজ। অ-বাস্তববাদী শিল্পে বিস্তার কার্য খুঁটিনাটির সামগ্রিক তাৎপর্যটিকে বাদ দিয়ে খণ্ডিত খুঁটিনাটিকেই জয়যুক্ত করা হয়।' (আরার্গ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) সেজন্য বাস্তববাদে অন্যভাবেও শিল্পীর স্বাধীনতা বেড়ে যায়, কারণ বাস্তববাদে যথাযথ সাদৃশ্যের জন্য লেখক হন্যে হয়ে ঘোরেন না, ফলে মূল লক্ষ ছেড়ে সেখানে অবাস্তর জিনিসের উপর দৃষ্টি দেবার অবকাশ কম, তা ছাড়া শিল্পকে তাৎপর্য-পূর্ণ করাই যেখানে শিল্পীর সদিচ্ছা, সে ক্ষেত্রে নিজের উদ্ভাবন বা পর্যবেক্ষণকে সীমাবদ্ধ করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

শিল্পী বরাবরই তাঁর অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান, এবং সেই অভিজ্ঞতা যে বর্তমান অভিজ্ঞতার জনক তা বলা বাহুল্য, আর সেই বর্তমানের মধ্য দিয়ে তাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যতে প্রসারিত হয়, তাই লেখক শিল্পী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারই ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেন, ফলে সেখানে জীবনের খণ্ডাংশ চিত্রিত হ'লেও তাতে জীবন সামগ্র্যর স্পন্দন ধরা যায়। অনেক সময় বাস্তববাদী শিল্প বা সাহিত্যে জীবনের খণ্ডাংশ-ই নির্বাচিত হয়, কারণ মাধ্যমেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে, বাস্তববাদী শিল্পী তা জানেন ব'লে ঐ সীমাবদ্ধ মাধ্যমের মধ্যে তুলে ধরেন জীবনের তাৎপর্য, যেহেতু ব্যাপ্ত জীবনে যা অফুরন্ত বা অসীম ব'লে মনে হয়, তা-ই এখানে বাঁধা পড়ে শিল্প সাহিত্যের নিজস্ব নিয়মে, এবং এর পেছনে কাজ করে বাস্তববাদী শিল্পীর সচেতন মন, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব, যে তত্ত্ববিশ্বের সাহায্যে তিনি এলোমেলো জীবন ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আনেন। (এ প্রসঙ্গে জন বার্জারের আর্ট এণ্ড রেভলিউশন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

উপন্যাসে ব্যক্তির জীবন-ই মুখ্য এবং ব্যক্তির অস্তিত্ব যখন দেশ কালের উর্ধ্বে নয়, এবং ব্যক্তি কোনও না কোন অভিধায় যুক্ত তখন

দেশ কালের সীমায় চরিত্রদের সাবয়ব ও শরীরী করা ছাড়া ঔপন্যাসিকের গত্যন্তর নেই। সেজন্য মানুষ ও সমাজ-কে একই সক্রিয়তার অঙ্গ হিসেবে চিত্রিত করা কর্তব্য, এই প্রক্রিয়ায় চরিত্র উপস্থাপিত করলে সামাজিক নকশার টানে চরিত্রের পৃথক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হয়। তাই মানুষ-কে সামাজিক পটে বিন্যস্ত করার ফলে এ কথাই পরিস্ফুট হয় যে, চরিত্র ও পরিস্থিতির বিশেষ ও সাধারণ গুণ অঙ্গাঙ্গি সংশ্লিষ্ট হয় সজীবতার বুনটে এবং এ সম্পর্কে সচেতনতার অর্থ যে বাস্তব-কে ধরার চেষ্টা তা বলা বাহুল্য।

চরিত্র ও পরিস্থিতির বিশেষ ও সাধারণকে জানার জন্য পদে পদে ঘটনা ও চরিত্রের উপরিতল পরিত্যাগ ক'রে চরিত্র ও ঘটনার মর্মস্থলে উপনীত হওয়ার চেষ্টা ঔপন্যাসিকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু চরিত্র ও ঘটনা আপাত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মনে হ'লেও আসলে উভয়ে পরস্পর নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ সমাজ সংসারের একটি সূক্ষ্ম অথচ অমোঘ সূত্রে, এই আপাত বিচ্ছিন্নতা মোচন ঔপন্যাসিকের কর্মের অন্তর্গত। তাই ঔপন্যাসিকের পক্ষে সমাজ সংসারের দিক থেকে মুখ ফেরানো অসম্ভব, কারণ সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় উপন্যাসে মানবিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় অতি প্রয়োজনীয়, এবং এই সম্বন্ধ নির্ণয়ে ঔপন্যাসিকের বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধের তর-তম-এর উপরই উপন্যাসের সাফল্য অসাফল্য শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব নির্ভরশীল, যদিও বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধ ভাসা ভাসা সহজ সরল ব্যাপার নয়, সেজন্য বৈষয়িক বুদ্ধির কুটিলতাও অপ্রয়োজনীয়, কারণ উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি নিদারুণভাবে শূন্য, ঔপন্যাসিক বাস্তবতার জন্য অন্তর্দৃষ্টি একান্ত অপরিহার্য। এই অন্তর্দৃষ্টির বলেই ঔপন্যাসিক অতীত ও বর্তমানের উপরের

বাস্তবতা পেরিয়ে যা বহমান ও সমৃদ্ধ সেই প্রকৃত বাস্তবের অতলান্তে ঝাঁপ দিয়ে জীবন সামগ্র্য তুলে ধরতে সক্ষম হন, সে হিসেবে ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টি দূরদৃষ্টির সামিল।

কোন কিছুই স্বতোৎপন্ন নয়, আপাত দৃষ্টিতে তেমন ম'নে হলেও সেই ঘটনা বা প্রতিক্রিয়া অন্যান্য অসংখ্য প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কারণের যোগ বিয়োগ গুণে উৎসৃজিত, সেই সব সূক্ষ্ম স্থূল দৃশ্য অদৃশ্য আকস্মিক স্বাভাবিক কার্যকারণ যোগাযোগ আবিষ্কার ও সেই আবিষ্কারের ঔপন্যাসিক রূপায়ণ আলোচ্য ক্ষেত্রে বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তববোধরূপে চিহ্নিত। তাই স্বভাবের অনুকরণ বাস্তব নামের অযোগ্য, ঔপন্যাসিক অনুকরণে নয় সৃষ্টির সাহায্যে বাস্তবের স্বরূপ প্রকাশে তৎপর, কারণ সত্য অনুসন্ধান ও সেই অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা বা তাৎপর্য অনুপ্রাণনই হচ্ছে ঔপন্যাসিক লক্ষ্য।

অন্যদিকে সমস্ত কিছু ইঙ্গিতবহ, এই ইঙ্গিতও নিশ্চয়ই স্বসমুত্থ কোনও ব্যাপার নয়, সেজন্য ইঙ্গিতের পশ্চাতে বিদ্যমান কারণসমূহের প্রকৃতি সন্ধান ও বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের কর্তব্য; যেহেতু এই কারণগুলিই কোনও কিছুকে ঈষৎ ইঙ্গিতময় করার জন্য কোন-না-কোন প্রকারে সক্রিয়, তাই সামাজিক পারিবারিক প্রাতিস্বিক নৈসর্গিক পৃথিবীর তাবৎসম্পর্ক ও বস্তুনিচয়ের কাটাকুটির মজাদার অথচ অনিবার্য খেলা সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি সজাগ ও মনস্ক থাকা শুধু স্বাভাবিক নয়, উচিতও বটে।

উপন্যাসে ব্যক্তির জীবনই মুখ্য, যে ব্যক্তি আত্মপ্রকাশের তাগিদে সামাজিক সাংসারিক অনুশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত যদিও ব্যক্তি অনন্ত দেশ কালের সীমায় একটি নির্দিষ্ট দেশ-কালের বাসিন্দা, তবু রেনেসাঁসের পর কূপমণ্ডুকতার স্থান নেহাৎ সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রাদেশিক মানুষ নয়, তার মানস-

পরিমণ্ডলে ভিনদেশী আবহাওয়ার স্পর্শ লাগা আশ্চর্যের নয়, তদুপরি বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব ও অভিনব উন্নতির ফলে আমরা আজ দূর নিকট সকলের প্রতিবেশী, আমরা একই সঙ্গে স্থানিক ও আন্তর্জাতিক, তাই যে-কোনও প্রান্তের মৃদু আলোড়নও আমাদের মনে স্পন্দন ও বিক্ষোভ জাগাতে সক্ষম। ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব এই সব সূক্ষ্ম অনুরণনের প্রকৃতি অনুসন্ধান, কারণ উপন্যাসে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবার ও সমাজের—সেই সুবাদে বিশ্বের, এবং ব্যক্তির মধ্যস্থিত নানা বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্ব-মিলন, নিসর্গের সঙ্গে তার বৈরিতা ও সখ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও নিরূপণ সাফল্যের পরাকাষ্ঠা; এবং এই জন্য উপন্যাস নাটক কবিতার চেয়ে পূর্ণাঙ্গ শিল্প। এই শিল্পরূপ অনন্ত সম্ভাবনাময়, যেহেতু রাষ্ট্র সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক বিরোধের সংঘর্ষের। উপন্যাসের জন্মই এই বিরোধের মধ্যে। এ বিরোধ সম্পর্কে সচেতন না হ'লে উপন্যাস রচনার চেষ্টা ব্যর্থতার নামান্তর। তাই বাস্তব জ্ঞান ও বোধ উপন্যাস রচনার পক্ষে আবশ্যিক, একমাত্র এই বোধ ও জ্ঞানের জোরে বিশ্লেষণের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপন সম্ভব, এবং জীবনের বিরাট তাৎপর্য সেই সূত্রে ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয় উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে।

২

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে পরিবর্তনের গতি বাস্তবের উপরিতলে বাস্তবের মর্মস্থল থেকে ক্ষিপ্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সেজন্য ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের গতি উপরিতলের পরিবর্তন হারের সমানুপাতিক হওয়া আবশ্যিক—এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক;

উপরের ও ভিতরের পরিবর্তনের অসম হার সত্যানুসন্ধানের পথে বিঘ্নস্বরূপ নিঃসন্দেহে, এবং সে সময় ঔপন্যাসিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'লে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা অন্যায়। বাস্তবের প্রকৃত রূপ ভিতরেই অনুসন্ধেয়, অথচ উপরের দ্রুত পরিবর্তনে ভিতর অনেকাংশে আবৃত থাকে, তখন উপরের আলোড়ন সত্য ব'লে প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নয়, যদিও এ সত্য প্রায় ক্ষেত্রেই সত্যের ছলনামাত্র। ভিতর বাইরের দ্বন্দ্বে বিরোধের সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের একান্ত কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত, কারণ সেই অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে বাস্তবের জটিলতা প্রকাশিত হয় নানা তরঙ্গবিভঙ্গে। তদুপরি যে মানুষ উপন্যাসে উপজীব্য, সে মানুষের গোচর অগোচর জীবন একমাত্র ঔপন্যাসিক-ই চিত্রণে সক্ষম, অথচ গোচর অগোচর জীবনের মধ্যেও বিরোধ বর্তমান, এই বিরোধের নিষ্পত্তি না করলেও উপন্যাস রচয়িতা তার কারণ ও তাৎপর্য আবিষ্কারে নিশ্চয়ই মনোযোগী হন; আবার ব্যক্তি সামাজিক জীব, সুতরাং ব্যক্তিকে সমাজ সন্ন্যস্ত ক'রে সম্পর্কের স্বরূপ পর্যবেক্ষণ ও নিরূপণ ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব, যদিও এ-ক্ষেত্রেও বিরোধের চিত্রই স্পষ্ট।

মানুষের প্রাতিস্বিক ও সামাজিক সত্তার মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব বর্তমান, অন্তত উপন্যস্ত চরিত্র কোনও না কোন ভাবে সমাজের শাসন অনুশাসনে উত্ত্যক্ত। সময় সময় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। অর্থাৎ সর্বত্রই বিরোধের চিত্র ঔপন্যাসিকের সম্মুখে জাজ্বল্যমান, এবং বাস্তবের জীবনের দ্বন্দ্বময় আলেখ্য এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে আত্মহননের সামিল। এমন সংঘাতসঙ্কুল জীবন-চিত্র, অনেকের মতে, একমাত্র নাটকীয় পদ্ধতিতেই প্রকাশ করা সম্ভব, অথচ এ-বিষয়ে আমাদের অভিহিত হওয়া প্রয়োজন যে কেবল পদ্ধতিগতভাবে নাটক ও উপন্যাস স্বতন্ত্র নয়, নাটক ও উপন্যাসের প্রসঙ্গও ভিন্ন ধরনের,

সেজন্য একই আধেয় নিয়ে নাটক ও উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। নাটকের প্রাণকেন্দ্র সংঘাত, সেই কেন্দ্র-কে আবর্তন ক'রে নাটক সফল হয় গতির সামগ্রিকতায়, সেজন্য উপন্যাসের মত চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও অভিব্যক্তির পরিচয় মেলা ধরা নাটকে সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় চরিত্রের চোদ্দপুরুষের বিবরণ দেওয়া অথবা সেই চরিত্রের সমূহপরিচয় পরিবারের উত্থান পতনের পরিপ্রেক্ষিতে।

অন্যপক্ষে উপন্যাসে এ-সব পরিচয় উহ্য থাকলে সে উপন্যাসের কপাল মন্দ তা বলা বাহুল্য, ফলে বিষয়বস্তু নির্বাচনে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের ধ্যান ধারণা ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। নাটকের কারবার মানুষের ব্যক্ত অংশ নিয়ে এবং তা ক্রিয়ায় বা কথার মাধ্যমে প্রকাশিত, ফলে ক্রিয়াকলাপের বাহ্যিক প্রকাশের রূপায়ণ-ই শিল্প হিসাবে নাটকের চৌহদ্দি, পাত্র-পাত্রীর আচার আচরণ সংলাপ প্রভৃতি বিবিধ বহিঃস্থ ক্রিয়া নাট্যকারের নাটকীয়তা সৃষ্টির সহায়, নাটকে জীবনের গতিশীলতা ও পরিবর্তমানতা চাক্ষুষ করানো হয় ব'লে বর্ণানাত্মক রীতি নাটকের পক্ষে প্রায় সম্পূর্ণ অচল। চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের মন্তব্য আমাদের কাছে অগ্রাহ্য, কারণ চোখের সামনে পাত্র-পাত্রীদের সম্পন্ন কাজ-ই তাদের চরিত্র প্রকাশক। অন্যপক্ষে উপন্যাসে থাকে যা ঘটেছে তার কাণ্ডকারখানা, এবং বিবরণদানকারী যতই নিজেকে লুকতে চেষ্টা করুন না কেন পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন যে তার কণ্ঠস্বরে কেবলই অতীতের কথা বা যে ঘটনা ঘটে গেছে তার বিবরণ অনুরণিত হচ্ছে, এজন্য উপন্যাসে স্মৃতি-র এত ভীড় এবং সংঘটিত ঘটনার উপর ভাষ্য এখানে অচল নয়, বরং তা উপন্যাসের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমের পথ প্রশস্ত করে; অথচ নাটকে এর স্থান একেবারেই শূন্য। থর্ণটন উইলডারের মতে মঞ্চে সবটাই হচ্ছে এখনের ব্যাপার, (রাইট্যারস্ এট্

ওআর্ক গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য দ্রষ্টব্য), সে জন্য নাটকে প্লটের স্থান তুচ্ছ নয়।

প্লটের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ অবশ্য অ্যারিস্টটলেরও নির্দেশ, ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনায় চরিত্রের স্থান দ্বিতীয়, বরং গৌণ বলা অত্যুক্তি নয়। অ্যারিস্টটলের সাহিত্য-তত্ত্ব অসাধারণ প্রতিভার ফসল একথা অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র, তবু সেই অসামান্য আলোচনায় মানুষের অর্ধঅস্তিত্ব প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকে, অবশ্য তাঁর আলোচনা ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত ব'লে এ উপেক্ষা স্বাভাবিক ছিল। নাটকে যাবতীয় মানসিক সংঘাত, মনের নিজস্ব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখানো প্রায় অসম্ভব, কারণ মানুষের সকল ক্রিয়া-কলাপের বহিঃপ্রকাশ নেই, এবং যে ক্রিয়া বাহ্যপ্রকাশ শূন্য, সে ক্রিয়া নাটকের পরিধি বহির্ভূত। অবশ্য স্বগতোক্তি মাধ্যমে চরিত্রের অন্তর্বিরোধের চিত্র উপস্থাপিত করার কৌশল আমাদের জানা, কিন্তু স্বগত উক্তির ব্যাপক প্রয়োগ যে নাটকের পক্ষে মর্মঘাতী তা অনায়াসবোধ্য। নাটক যে দৃশ্যকাব্য তার একটি প্রমাণ এই যে নাটকের ঘটনা ক্রিয়া ইত্যাদি সচরাচর কথোপকথনে গ্রন্থিত, অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, যে পুস্তক কথোপকথনে গ্রন্থিত তাই নাটক। 'পোয়েটিকস্'-এ অ্যারিস্টটল নাটকের প্রায়োগিক দিকের কথা বাদ দিলেও এবং 'পোয়েটিকস্' পাঠান্তে ট্র্যাজেডিকে পাঠ্যকাব্য ব'লে মনে হলেও ট্র্যাজেডি যে ক্রিয়ানুকারী এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হই। এমন কি 'লোকবৃত্তানুকরণং' বা দশরূপকে 'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম' (১।৭) প্রভৃতি নাটকের সংজ্ঞায় নাটক দৃশ্যকাব্যরূপেই বিবেচিত।

জীবন-সামগ্র্য রূপায়ণ নাট্যকারেরও উদ্দেশ্য, কিন্তু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এইখানে যে নাটকে বস্তুসামগ্র্য-র (totality of objects) স্থান গতি-সামগ্র্য (totality of move-

ment)-র দ্বারা অধিকৃত, সেজন্য নাটকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। প্রকৃত বাস্তবের বনিয়াদের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ঘটনার সংযুক্তিকরণে বস্তুসামগ্র্যের সৃষ্টি হয়, তার মানে বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে ঐ অজুহাতে যেমন তেমন ভাবে জুড়ে দেয়া নয়, উপন্যাসে মানুষের সামাজিক ক্রিয়া ও সমাজের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় বিশেষ জরুরী, পক্ষান্তরে নাটকে এই সম্বন্ধ নির্ণয় মূল কথা নয়, কারণ এ নির্ণয়ে চরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখানো একান্ত প্রয়োজন যা অবশ্য নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর, সংঘর্ষ-কে কেন্দ্র ক'রে জীবনের প্রকাশ ঘটে জন্য সমস্ত কিছুর খুঁটিনাটির বদলে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্টের প্রতিভূস্থানীয় প্রতিফলনের উপর নজর পড়ে বেশী, সেজন্য নাটকে বস্তুসামগ্র্য সৃষ্টি হয় না, তার প্রাণ গতিসামগ্র্য সৃষ্টিতে। (এ সম্পর্কে Georg Luka's এর 'দি হিস্টোরিক্যাল নভেল' গ্রন্থের 'হিসটোরিক্যাল নভেল এণ্ড হিস্টোরিক্যাল ড্রামা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

বিরোধের চিত্র উপন্যাসের উপজীব্য হ'লেও সেই বিরোধ কেবল-মাত্র বাইরের নয় তা অন্তর বাহির গুপ্ত প্রকাশ্য চেতন অচেতন যাবতীয় কর্মের চিন্তার দেহের মনের। অর্থাৎ দুই প্রকার বিরোধই (ব্যক্ত এবং অব্যক্ত) উপন্যাসে অবলম্বিত হয়। মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব, একটা গোটা জীবন—তার অন্ধকারতম প্রদেশ থেকে উজ্জ্বলতম আলোকিত উদ্ভাস—উপন্যাসের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত শিল্প, তার পরিধি যতই বিস্তৃত বা কেন্দ্র যতই গভীর হোক না কেন, জীবনের তাবৎ কর্মকাণ্ড রূপায়ণে নিশ্চয়ই সক্ষম নয়। শিল্পমাত্রই নির্বাচন, এবং যথাযোগ্য নির্বাচনে শিল্পীর দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। নাটক যেহেতু বাহ্যক্রিয়া ও সংঘাত প্রকাশে সীমাবদ্ধ, সেজন্য নাটকে নির্বাচনের গণ্ডি আরও সীমাবদ্ধ হয়,

একমাত্র সেইসব ঘটনা ও চরিত্র নির্বাচিত হয় যে ঘটনা ও চরিত্র নাটকের গতি অব্যাহত রাখার পক্ষে অনুকূল। সেজন্য নাটকে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্র অপরিসরবদ্ধ—নাট্যিক ক্রিয়া ও গতির জন্য যতটুকু প্রয়োজন নাটকের পাত্র-পাত্রীর স্বাধীনতা মাত্র ততটুকু। বলা বাহুল্য উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত, চরিত্রদের স্বাধীনতা নাটকের মত নিদারুণ সঙ্কুচিত নয়। গতি স্থিতি কর্ম অকর্ম—সমস্তই উপন্যাসের বিষয় হয় জীবনসামগ্র্য রূপায়ণের ঐকান্তিক প্রয়াসে। তাই উপন্যাস ও নাটকের পার্থক্য উপরিতলের পার্থক্য নয়, এ পার্থক্য মৌলিক ও গভীর।

অতএব অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডীর আত্মা ও শরীর সংক্রান্ত মতামত ব্যাপকভাবে নাট্যালোচনায় প্রযুক্ত হ'লেও উপন্যাস বিচারে সেই মানদণ্ডের প্রয়োগ যথেষ্ট সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি ক্রিয়া অনুকারী, জীবন মানে ক্রিয়া, এই অনুকরণের প্রাণবিন্দু প্লট, প্লটই গতি এবং গতির মধ্যে অবস্থিত চরিত্র তার সহায় মাত্র। অথচ এ বিষয়ে আমরা অবহিত যে, প্লট কার্যাবলীর বিন্যাস: (অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্তও তাই), এবং সেক্ষেত্রে প্লট বাইরের কাঠামো মাত্র, অতএব সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন নয় যে, চরিত্র-ই ঘটনার কর্তা এবং প্লট চরিত্রের চলাফেরা আচার-আচরণ প্রকাশের ফল মাত্র। সেজন্য প্লটের প্রাধান্য নাটকের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়। কিন্তু চরিত্রের অসংখ্য কার্যাবলী ঐক্যে সংহত হয় প্লটের বুনুনিতে—একথা অস্বীকার করা মুস্কিল।

উপন্যাসের প্লট সে-গৌরবের অধিকারী নয়। কারণ উপন্যাসের একক হচ্ছে ঘটনা, যেমন কবিতার শব্দ; এই এককগুলির কেন্দ্রে আছে চরিত্র, যেহেতু উপন্যাসে ঘটনার তাৎপর্য নির্ভর করে পাত্র-পাত্রীর উপর, তাই ঘটনার মধ্যে একই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা,

অন্তরের প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তনের আভাস নিহিত থাকে স্বাভাবিকভাবে। বাইরের ঘটনা যেমন ভিতরে ঘটনার সৃষ্টি করে, তেমনি ভিতরের ক্রিয়া প্রাতক্রিয়াও বাইরে চাপ সৃষ্টি ক'রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল ঘটায়, অর্থাৎ এক একটি ঘটনা এক এক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং এর মধ্যে বিমূর্ত কিছুর অস্তিত্ব থাকে না সচরাচর, তাই প্রতিটি ঘটনা তার গণ্ডি-র মধ্যে বিশেষ হয়ে ওঠে, আর ঔপন্যাসিক সেই বিশেষ গেঁথে গেঁথে যে ইমারৎ নির্মাণ করেন তা হয়ে যায় সাধারণ, কারণ উপন্যাস জীবনের সমগ্র আলেখ্য, সেখানে জীবনের প্রকাশ চরিত্রের বাহ্যিক কাজকর্ম ও অন্তরস্থিত চিন্তাভাবনার জটিল বক্ররেখায় ; তাই প্লটের বাঁধনে জীবনের সমুদয় পরিচয় পাওয়া অসম্ভব, কারণ প্লটে জীবনের বাহ্যিক ঘটনাবলীই একমাত্র প্রকট করা সম্ভব, অথচ উপন্যাসের কথিত অংশ বাইরে প্রকাশিত ও অন্তরে সংঘটিত ঘটনাবলীর সমবায়ে রচিত হয়। বাইরের ঘটনা কার্যকারণে যুক্ত হলে তার নাম প্লট হওয়াই সংগত (বর্তমানে সমালোচকেরা অবশ্য প্লটের মধ্যে চিন্তা ভাবনাকে অন্তর্ভূ্ত করেন। প্লটে দু'টি বিষয়-ই অন্তর্গত—(১) বহির্ঘটনা ও পরিস্থিতি (২) মনের অন্তরে স্থিত অবস্থা)। অন্তরের চিন্তা-ভাবনার লয়-বিলয় মনের নানা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া অধিকাংশ বহিঃপ্রকাশ রহিত, তবু এ-গুলি বাইরের ঘটনার মত অভ্যন্তরে গতিযুক্ত, আর চিন্তা-ভাবনা তো একপ্রকার কর্ম বিশেষ, অন্তত অবদমিত কর্ম নিঃসন্দেহে। তাই প্লট উপন্যাসের কথিত অংশ প্রকটনের উপযুক্ত নাম নয়। আমরা উপন্যাসের কথিত অংশের অন্য নাম দেবার পক্ষপাতী, আমাদের নির্বাচিত নাম লোকবৃত্তান্ত। (আমি যাকে লোকবৃত্তান্ত নাম দিচ্ছি, আধুনিক সমালোচকগণ সেই গুণগুলিকে প্লটের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন, সেজন্য আধুনিক সমালোচকগণের প্লট এবং

আমার ক্ষেত্রে লোকবৃত্তান্ত সমার্থক)। অবশ্য এ ধরনের সমালোচকের সংখ্যা অতি নগণ্য, এখনও প্লট সম্পর্কে অ্যারিস্টটলীয় ধারণা অথবা ফর্স্টারের সংজ্ঞাই অধিকাংশের কাছে মান্য হয়ে আছে।

অতএব অনুমান করা সহজ যে, অন্তত নাটকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে, লোকবৃত্তান্ত উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দু, যেহেতু লোকবৃত্তান্তে চরিত্রের ভিতর বাহির কর্ম চিন্তা প্রকাশিত অপ্রকাশিত বিরোধ বিধৃত হয়। কিন্তু উপন্যাসে চরিত্রের স্বাধীন ভূমিকা তার ঘটনা সৃষ্টি-কারীক্ষমতা বা ঘটনার দাসে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তুচ্ছ নয়, এবং লোকবৃত্তান্ত বহুলাংশে চরিত্রদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, সেজন্য লোকবৃত্তান্তকে উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দু বলা অযৌক্তিক।

অন্যপক্ষে মাত্র সংঘাত বা ক্রিয়া রূপায়ণ-ই উপন্যাসের লক্ষ নয়, গতি স্থিতি ক্রিয়া অক্রিয়া সংঘাত স্থৈর্য সমন্বিত জীবন-সামগ্র্য চিত্রায়ন ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য, তদুপরি উপন্যাসের রূপায়ণ পদ্ধতি বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণমূলক, সেজন্য নাটকের মত ক্রিয়াবস্থার ঘটনাই উপন্যাসের একমাত্র আশ্রয় নয়, ঘটনা ঘটার পর বর্ণনাতে অথবা বিবৃতিমূলক ভঙ্গীতে ঘটনা উপস্থাপনা উপন্যাসের অন্যতম রীতি-ই নয়, বরং এই বর্ণনাত্মক রীতি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণ করার একটি আশ্চর্য কৌশল বটে, বর্ণনাত্মক পদ্ধতি সংশ্লেষণের সহায়কও বটে। বর্ণনায় ঘটনা উপস্থাপিত ক'রে বিশ্লেষণের সাহায্যে চরিত্রের মতিগতি নিরূপণে জীবনের নানা স্তরের সূক্ষ্মস্থূল জটিল রহস্য উদ্ঘাটন করা সহজ ও সম্ভবপর। অথচ একথা স্বীকার্য যে বিশ্লেষণের অতিরিক্ত ঝোঁকে ঔপন্যাসিকের বিষয়মুখিতা ব্যাহত ও বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আর বিষয়মুখ দৃষ্টি হ্রাস পেলে উপন্যাসের কপাল মন্দ একথা বলাই বাহুল্য।

এ সময়ে বাস্তব জ্ঞান ও বোধ ঔপন্যাসিকের ত্রাণকর্তা, এই বোধ ও জ্ঞানের সাহায্যে তিনি জানতে সক্ষম তাঁর দৌড় কতদূর। এ ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক প্রণালী ঔপন্যাসিকের সহায় বিশেষ, কারণ বিশ্লেষণের পর বিচ্ছিন্নতায় ঔপন্যাসিক ঐক্য স্থাপনে সক্ষম হন বর্ণনার সাহায্যে, অবশ্য বর্ণনার এই সংশ্লেষক শক্তি লেখকের বাস্তবজ্ঞান ও বোধ থেকে উৎপন্ন হয়। বিশ্লেষণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও পৃথকীকরণের যে আশঙ্কা বিদ্যমান (বিশ্লেষণের ঝোঁকে ক্রমে কার্যের উৎস সন্ধানে নামতে নামতে পরিবেশ পরিজন এমনকি নিজের ভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব বিচ্যুত ব্যক্তির অবচেতন মন শেষ এবং একমাত্র আশ্রয়রূপে বিবেচিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা) সে আশঙ্কা অন্তর্হিত হতে বাধ্য ঔপন্যাসিকের নিরন্তর সজাগ দৃষ্টির তাড়নায়। ঔপন্যাসিকের সজাগ মনস্ক দৃষ্টি আত্মবশ দর্শন নয়, বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধের তর তমের উপর এই দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা হীনতা নির্ভরশীল।

আবার বাস্তব জ্ঞান ও বোধ বস্তুজগতের অধীন, ঔপন্যাসিকের সম্মুখে তাই কোনও সময়ে জগৎ-চিত্র আচ্ছন্ন বা অনচ্ছ অবস্থায় থাকে না, ফলে উপন্যাসের বিশ্লেষণ রীতি সর্বদাই নানা স্তরান্বিত সম্পর্কের সূত্র ধরেই ক্রিয়াশীল, এবং সম্পর্কগুলি মূর্ত ও কার্যকারণের নিয়মে পরিচালিত হয়। সেজন্য এক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ঔপন্যাসিকের বাস্তব জ্ঞান ও বোধে প্রতিষ্ঠিত কার্যকারণে গ্রথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

এ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যেহেতু ঔপন্যাসিকের বাস্তব জ্ঞান ও বোধ বস্তুজগতের অধীন, সেহেতু বস্তুজগতের হুবহু প্রতিলিপি চিত্রণই বাস্তব জ্ঞান ও বোধ। উত্তর নঙর্থক-ই, কারণ বস্তুজগতের হুবহু প্রতিলিপি চিত্রণ সম্ভব নয়, তা যে কোনও প্রতিভাধরের পক্ষেও সাধ্যাতীত। একমাত্র যন্ত্রই বোধ হয় কোন কিছুর হুবহু প্রতিলিপি

চিত্রণে সক্ষম, অবশ্য যন্ত্রেরও ক্ষয়-ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। ঔপন্যাসিকের পক্ষে অনুকরণের প্রশ্ন নিরর্থক-ই নয়, অবান্তরও বটে। বাস্তবের অনুলিপি নয়, জীবনসামগ্র্য প্রকাশের জন্য বাস্তব থেকে উপাদান আহরণ ক'রে সেই উপাদান বা উপাত্ত-র মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সেই সূত্রে একটি অখণ্ড রূপ সৃষ্টি করা উপন্যাসের লক্ষ, হয়ত তাবৎ শিল্পই এই পুনর্নির্মাণ, তবু ঔপন্যাসিকের পুনর্নির্মাণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। জীবন সদৃশ করার জন্য নাটকে বাস্তবের অধ্যাস সৃষ্টি প্রয়োজন, এবং প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা অধ্যাস সৃজনের অতিশয় অনুকূল হয় আলোক-সম্পাত, সঙ্গীত বা নট-নটীদের অঙ্গভঙ্গী, সংলাপ, প্রেক্ষকদের একাগ্রতা ইত্যাদিতে। নাট্যকারের শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিনয় কালে দর্শকমনে অধ্যাসের জন্ম হয় স্বাভাবিকভাবে এবং এখানেই অভিনব গুপ্ত কথিত সাধারণীকরণের অভূতপূর্ব তাৎপর্য নিহিত, তাই নাটকে ঘটনা চরিত্র প্রতীতিযোগ্য বা সম্ভাব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু উপন্যাসের লোকবৃত্তান্ত চরিত্র সমাজ ও মানুষের সর্বাত্মক সত্তায় পরিস্ফুট হয় ব'লে উপন্যাসে অধ্যাস সৃজন অপেক্ষা অনিবার্যতার কথাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ উপন্যাসে লোকবৃত্তান্ত চরিত্র প্রভৃতি যুক্তির সূত্র অনুসরণ ক'রে কার্যকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির ব্যবহারে। ফলে এখানে উল্লম্ফনের সুযোগ শূন্য এবং চরিত্রের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অংশ পাঠক সম্মুখে অনাবরিত থাকার জন্য পাঠকদেরও অধ্যাসজনিত বিহ্বলতায় থাকা সম্ভব নয়। উপন্যাসের রীতি বৈজ্ঞানিক, এ-কথা সকলের বিদিত যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অধ্যাস সৃজনের ঘোরতর শত্রু।

তবু সময় সময় পাঠকের "পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ" (পরের কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়, আমার কিন্তু সম্পূর্ণ আমার নয়)

মন্তব্য সত্য ব'লে মনে হওয়া অসংগত নয়। চরিত্র ও পাঠকের সাধারণ সম্বন্ধ (আইডেন্‌টিফিকেশান্‌) সৃষ্টি কোনও অধ্যাসজনিত ব্যাপার নয়, মূলতঃ উপন্যাসের আরোহ প্রণালী (বিশেষ থেকে সামান্যে) সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য দায়ী। উপন্যাসে অধ্যাস সৃজনের স্থান কম; বরং অধ্যাস চূর্ণ করাই ঔপন্যাসিকের কাজ, সেজন্য পাঠকের মনোযোগ বারংবার ছিন্ন হ'লেও ক্ষতি হয় না। এক বৈঠকে উপন্যাস শেষ করা তাই আবশ্যিক বা জরুরী নয়। সৃষ্টিশীল সাহিত্য শিল্পের অন্যান্য শাখার মত উপন্যাস নিশ্চয়ই জীবনের অনুভূতির প্রকাশ, কিন্তু উপন্যাসে যুক্তি বুদ্ধির স্থান নেহাৎ তুচ্ছ নয়, বরং যে কোনও শিল্পের তুলনায় উপন্যাসে যুক্তি বুদ্ধির পরিমাণ ও মাত্রা বহুগুণ, বেশী, সেদিক থেকে উপন্যাস বিজ্ঞানের মতই মননপ্রধান।

৩

উপরের আলোচনায় আমরা একথা প্রমাণে সচেষ্ট যে উপন্যাসের আত্মা ও শরীর অন্যান্য শিল্প-সাহিত্যের উপজীব্য ও উপস্থাপনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপন্যাসের শ্রেণী, চরিত্র সমস্ত কিছুই আলাদা, সেজন্য উপন্যাস কাব্যিক বা নাট্যিক অথবা মহাকাব্যিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, উপন্যাস উপন্যাসীয় হওয়াই সংগত ও উচিত।

কোন কোন রসবেত্তা উপন্যাস ও মহাকাব্যের সাদৃশ্য সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ, এবং উপন্যাসকে আধুনিক মহাকাব্য বলার পক্ষপাতী অন্তত আকারে প্রকারে উপন্যাস মহাকাব্যের সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়, কিন্তু আন্তর ধর্ম ও সেই সুবাদে প্রকাশ পদ্ধতি—উভয়ত

উপন্যাস ও মহাকাব্যের কোনই মিল নেই, বরং উভয়ের লক্ষ, উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক বলা অত্যুক্তি নয়।

মহাকাব্য সংগতভাবে নিসর্গের সঙ্গে উপমেয়—নিসর্গের ব্যাপ্তি, গভীরতা, বর্ণ-বৈচিত্র্য, বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, ভয়াবহ স্তব্ধতা, প্রবল বিক্ষোভ—সমস্ত কিছুই মহাকাব্যের সমগ্র শরীরে লক্ষ্যযোগ্য। বিশাল সমাজ, বিরাট দেশ—তার সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে মহাকাব্যে স্পন্দিত হয়। মহাকাব্যের মানুষ ও সমাজ অপৃথগন্ন এবং সে-মানুষ ও সমাজ ইতিহাস-বিবর্জিত পুরাণ ও বাস্তবের একাকার একটি অভূতপূর্ব প্রকাশ। ঘটনার পর ঘটনা, গল্পের পর গল্প, চরিত্রের পর চরিত্র—একটা অনন্ত স্রোতের মত, সেখানে মানুষের বিশেষ ও বিশিষ্ট পরিচয় ছাপিয়ে সমাজ ও দেশ-ই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হয়ত তখন সভ্যতা ও সমাজের স্থিতাবস্থা ব'লেই মানুষ ও সমাজের একাত্মতা বিস্ময়ের নয়।

কিন্তু উপন্যাসে সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হয় ব্যক্তির মাধ্যমে, যে-ব্যক্তি একই সঙ্গে সামাজিক ও প্রাতিস্বিক জীব। অতএব উপন্যাসে মানুষ ও সমাজের সম্বন্ধ স্থির নয়—প্রতিযোগীর। বিশাল সমাজালেখ্য মহাকাব্যে চিত্রিত হওয়ার ফলে মহাকাব্যের রূপকল্প শিথিল ও সময় সময় এলোমেলো হয়। আবার পুরাণ এবং বাস্তবের একাকার ও সংমিশ্রণে গঠিত মহাকাব্য সর্বদা কার্যকারণের নিয়মাধীন নয়, সেখানে বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য সম্ভাব্য অসম্ভাব্যর সহ-অবস্থান; ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মের প্রকাশ, কোন ক্ষেত্রে নিয়মের প্রচণ্ড লঙ্ঘন হয়, তদুপরি মানুষ সেখানে দেবকৃপাপ্রার্থী অথবা দেব-নিগৃহীত জীব। দেবতার উপস্থিতি ও দৈব অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা সমস্ত যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বের ব্যাপার। অতএব সেখানে অরাজকতা স্বাভাবিকতারই অন্য নাম।

উপন্যাসের মানুষ দেব কৃপাপ্রার্থী বা দেব-নিগৃহীত জীব নয়, সে ব্যক্তি—প্রাণচঞ্চল মানুষ হৃদয় ও বুদ্ধির সমাহারে, এবং ব্যক্তির মাধ্যমে জীবন-সামগ্র্য সন্ধান, জীবনের তাৎপর্য ও সত্য আবিষ্কার ঔপন্যাসিকের লক্ষ, তাই উপন্যাস অরাজকতার শ্রীক্ষেত্র নয়, এমন কি জীবনের আকস্মিকতার কারণ অনুসন্ধানও ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত হয়। ফলে উপন্যাসে শিল্পরূপ সংহত ও নিবিড়। মহাকাব্য ও উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার পার্থক্য বাদ দিলেও উপন্যাস-কে মহাকাব্যের আধুনিক রূপায়ণ বা আধুনিক মহাকাব্য বলা সঙ্গত নয়, মহাকাব্যের সমস্ত কিছুই যেন একটি বিন্দুতে স্থির, কেবল কাহিনীর অনন্ত প্রবাহ ছাড়া; যদিও সে-প্রবাহ পুনরুক্তি, কেবল পুনরুক্তিই মাত্র। প্রতিটি মানুষ সেখানে গুণাগুণের প্রতিমূর্তি হিসাবে উপস্থিত, সেজন্য রাম বা যুধিষ্ঠির, রাবণ বা দুর্যোধন নায়ক বা উপনায়ক সকলেই অনড় চরিত্র, যারা কাহিনীর প্রথমে যে অবস্থায় উপস্থাপিত, কাহিনীর শেষে ঠিক একই বিন্দুতে অবস্থিত থাকে। কিন্তু উপন্যাসের সমস্ত কিছুই ক্রমোন্নতি ও বিকাশের স্তরে স্তরে নিটোল অখণ্ডতার পথে অগ্রস্য়মান। মহাকাব্যে দেশ-কালের ব্যবহার কোনও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ধরা যায় না, সময় ও দেশহীনতা-ই যেন মহাকাব্যের বিশিষ্টতা অথচ উপন্যাসে দেশ কালের ব্যবহার নির্দিষ্ট এবং চরিত্রদের তাই সাবয়ব ও শরীরী করার দায়িত্ব থাকে লেখকের, সেখানে প্রতিমূর্তি রচনার স্থান নেহাৎ শূন্য। তাই মহাকাব্য এবং উপন্যাসের পথ ও লক্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন, বরং প্রায় বিপরীত বলা অযৌক্তিক নয়।

উপন্যাসের তত্ত্ব রচয়িতাগণের অনেকে, যাঁদের রসবোধ ও সমালোচনা শক্তি প্রায় তর্কাতীত, উপন্যাসের উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে নাটকীয় বা মহাকাব্যিক প্রণালীর কথা উল্লেখ করেছেন,

তাঁরা সকলেই উপন্যাসের স্বরূপ, প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তবু তাঁদের এবম্প্রকার মন্তব্যে আমাদের সংশয় জাগা স্বাভাবিক, কারণ উপন্যাস সাহিত্য-শিল্পের একটি নতুন বিভাগ, একটি বিশেষ অবস্থায় নতুন মানুষের জীবনাগ্রহের ফসল। প্রাক্-রেনেসাঁস নাটক-কবিতার জীবনাগ্রহের সঙ্গে উপন্যাসের নতুন জীবনাগ্রহের তফাৎ আকাশ-পাতালের, কারণ এই নতুন জীবনবোধ নতুন বাস্তবতা উত্থিত দেবকৃপামুক্ত প্রাতিস্বিকতায় রক্তাক্ত সজীব মানুষের জীবন-বোধ। অতএব ঐ আধুনিক মানুষের জীবন রূপায়ণের জন্য আধুনিক রূপকল্পের প্রয়োজন, উপন্যাস সেই আধুনিক রূপকল্প। তাই কাব্যিক, নাট্যিক, মহাকাব্যিক প্রভৃতি প্রাচীন রূপকল্পে উপন্যাসের যথার্থ প্রকাশ অসম্ভব, এই সব রীতি-পদ্ধতি আত্মসাৎ ক'রে পূর্বসূরীদের* অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উপন্যাসে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা উপন্যাসীয় নিঃসন্দেহে।

৪

উপন্যাসীয় শব্দের অর্থ বিশদ করা প্রয়োজন, আলোচ্যমান প্রস্তাবে শব্দটির গুরুত্ব যথেষ্ট। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে নেতি নেতি ক'রে বিচার প্রথা সম্মত, এ স্থলেও আমরা নেতির সাহায্যে 'উপন্যাসীয়'-এর মর্মোদ্ঘাটনে সচেষ্ট হবো, এবং নেতির মাধ্যমে ইতি-বাচকেই আমাদের প্রস্থানের সমাপ্তি। উপন্যাসীয় নাটকীয় নয়, কাব্যিক নয়, মহাকাব্যিক নয়,—অথচ এ-সব অঙ্গীকৃত উপন্যাসীয় প্রকরণে। নাটকের ক্রিয়া বা সংলাপ, গীতিকবিতার আত্মমুখীতা, মহাকাব্যের কাহিনীর নিরন্তর প্রবাহমানতা এবং বিশাল সমাজ ও সামাজিকের ব্যাপ্তপটভূমি—উপন্যাসে বর্তমান, তবু উপন্যাস

এ-সবের অতিরিক্ত একটি অনন্য শিল্পরূপ যার প্রাণ আন্দোলিত হয় জীবন-সামগ্র্য রূপায়ণের অনন্য তাগিদে।

অন্যান্য সাহিত্যরূপের হয়ত একটি প্রাণকেন্দ্র আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয় (যেমন নাটকের প্রাণকেন্দ্র ক্রিয়া বা সংঘাত, গীতি-কবিতার আত্মপ্রতিফলন বা অব্যক্ত অংশের অনুপ্রাণনা), কিন্তু উপন্যাসের প্রাণ-বিন্দু কোনও একটি বিশেষ উপাদানে (লোকবৃত্তান্ত, চরিত্র প্রভৃতি) অনুসন্ধান করা যায় না। "উপন্যাস," হেনরী জেমস-এর ভাষায়, "অন্যান্য জীবের মত একটি সজীব পদার্থ, যা সবটাই এক এবং অবিচ্ছিন্ন," (দি আর্ট অব ফিকশান)। সেজন্য এক্ষেত্রে কোনও একটি অঙ্গের প্রাধান্য বিষয়ক তর্ক জ্ঞানীদের ব্যাসকূট মাত্র। উপন্যাস একটি অখণ্ড নিটোল প্রকাশ, সেই প্রকাশ শিল্পের নিয়মে সংঘটিত ; তাই লোকবৃত্তান্ত, চরিত্র, পরিবেশ, রচনারীতি প্রভৃতি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এবং প্রতিটি উপাদান উপন্যাসের নিয়মে যথাযোগ্যস্থানে স্থাপিত হয়, অথচ এগুলি শুধু প্রাণহীন অবয়ব সংস্থান নয় অথবা অলংকারের মত বাহ্যিক আভরণ, এগুলি অখণ্ড নিটোল প্রকাশ পরতন্ত্র। এবং আমাদের মতে সৎ ও সার্থক উপন্যাস বিচারের মাপকাটি এই অখণ্ড নিটোল প্রকাশ, কারণ "For out of the full play of all things emerges the only thing that is anything, the wholeness of a man, the wholeness of a woman, man alive, and live woman." (ডি. এইচ. লরেন্স : হোয়াই দ্য নভেল ম্যাটারস্ প্রবন্ধ)

এই অখণ্ড নিটোল প্রকাশ পূর্বোক্ত বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধের জন্য সম্ভব হয়, কারণ বাস্তব জ্ঞান ও বোধ নানা বিচ্ছিন্নতা ও অংশের মেল বন্ধনের শক্তি বিশেষ। জীবনের আপাত অরাজক ও বিশৃঙ্খল চিত্র নিশ্চয়ই ভীতিপ্রদ, অন্তত সেই আপাত-র অন্তরে প্রবেশ না

করা পর্যন্ত, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান ও বোধের অধিকারী ঔপন্যাসিক সেই অব্যবস্থায় বিচলিত হন না, যেহেতু এই জ্ঞান ও বোধের ফলে বাস্তব পুনর্নির্মাণের সমস্যা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাস্তব নিয়েই ঔপন্যাসিকের কারবার, অথচ বাস্তবের হুবহু অনুবাদ শিল্পসাহিত্যে অচল, কারণ বাস্তব ও সাহিত্য উভয়ই উভয়ের বিশিষ্ট নিয়মে পরিচালিত; তাই বাস্তবের নিয়ম সাহিত্যে খাটানো স্বৈরতার পরিচায়ক, যদিও বাস্তবের নিয়ম রূপান্তরিত বাস্তবে নির্বাসন দিতে চাইলেও জনকের প্রভাব এড়ানো কঠিন, হয়ত এ-প্রভাব এড়ানো যে কোনও শিল্পীর পক্ষে সাধ্যাতীতও বটে। তাই বাস্তবের পুনর্নির্মাণে একই সঙ্গে বাস্তব ও শিল্পের নিয়ম ক্রিয়াশীল। বলা বাহুল্য অনুকরণ-কর্ম ও সৃষ্টিশীল আবেগের মধ্যে বিরোধ বর্তমান। আবার জীবন-সামগ্র্য চিত্রায়নের জন্য জীবনের বাস্তবের পরিপূর্ণ স্পন্দন মেলে ধরা উচিত, সেই মেলে ধরার জন্য বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি বিশেষ উপযুক্ত, অথচ বিশ্লেষণে বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা অতি প্রকট; অন্য পক্ষে বর্ণনাত্মক রীতির সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষমতা সকলের বিদিত, তাই বিশ্লেষণে বিস্তার এবং বর্ণনার সংক্ষেপ ধর্মিতা অ-বিরোধের কাণ্ড নয়। জীবন-সামগ্র্য রূপায়ণে বাস্তব ও রূপান্তরিত বাস্তব, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ শক্তি ঔপন্যাসিকের অবলম্বন, তাঁর রচনার উপাদান। আর দুই বিপরীতের দ্বন্দ্বে তৃতীয় এক নতুনের উত্থান অনিবার্য, সেই তৃতীয় নতুনের উত্থান সম্ভব হয় উপন্যাসের অখণ্ড নিটোল প্রকাশে।

ঔপন্যাসিক যেহেতু স্রষ্টা, অতএব তিনি-ই সমস্ত কিছুর কর্তা ও পরিচালক, কিন্তু যে-শক্তির বলে তিনি অখণ্ড নিটোলত্ব প্রকাশে সক্ষম সে-শক্তির নাম বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধ। অনেকে অবশ্য

এই শক্তির নাম লেখকের জীবন-দর্শন, জীবন-দৃষ্টি ইত্যাদি দেওয়ার পক্ষপাতি; হয়ত এ-সব আখ্যা সঠিকও, কারণ শিল্পীর বক্তব্য রূপায়ণের মাধ্যমই হচ্ছে শিল্প। কিন্তু বক্তব্য রূপায়ণের জন্য শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নগণ্য নয়, ববং সময় সময় বক্তব্যের চাপে বা আরোপে সাহিত্য-শিল্প যান্ত্রিক ও প্রাণহীন হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে শিল্পীর জীবনদর্শনের মধ্যে, সে-দর্শন যতই উদার হোক না কেন, কিঞ্চিৎ গোঁড়ামির ভাব থাকা বিচিত্র নয়; ফলে জীবন-সামগ্র্য বা জীবনের তাৎপর্য, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে রূপায়িত হলেও, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়ে প্রকাশিত হতে বাধ্য, কারণ শিল্পীর ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর উপাদানের সম্পর্ক স্থিতির নয়—গতির। ফলে সেখানে লোকবৃত্তান্ত, চরিত্র ইত্যাদির নিজস্ব গতির সঙ্গে লেখকের ইচ্ছা রূপায়ণের দ্বন্দ্ব অনিবার্য, এবং এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন একান্ত বিধেয়, নচেৎ শিল্প যান্ত্রিক অথবা বিশৃঙ্খলের মেলায় পরিণত হয়। এই সামঞ্জস্য বিধান শিল্পসম্মত উপায়ে সম্ভব হয় লেখকের বাস্তব জ্ঞান ও বোধের ফলে, কারণ এই জ্ঞান ও বোধ নৈর্ব্যক্তিক এবং সৎবিচারক-তুল্য সমদর্শী।

ব্যালজাক ও তলস্তয়ের ব্যক্তিগত মতামত ও তাঁদের রচনাবলীতে প্রকাশিত জীবন-দর্শনের ব্যবধান দুস্তর, এবং শুধু লেখকের বক্তব্য রূপায়ণের নিরিখে এ-ব্যবধানের কারণ বা তাৎপর্য অনুসন্ধান সর্বদা ফলপ্রসূ হয় না, তাঁদের জীবন-দর্শনের বিপরীত চিত্রই সেই সব মহৎ রচনায় লভ্য, সে-ক্ষেত্রে মানুষ ব্যালজাক ও তলস্তয়ের উপর শিল্পী ব্যালজাক ও তলস্তয়-ই জয়ী হন। এ-বিজয় আমাদের নিরন্তর শ্লাঘার বিষয়। শিল্পীর বিজয় সম্ভব এবং কেবলমাত্র সম্ভব বাস্তব জ্ঞান ও বোধের তীক্ষ্ণতা ও গভীরতায়। পুনরুক্তি হলেও বলা উচিত যে, বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধে শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা-প্রতিভা,

সংবেদনশীলতা প্রভৃতি হাড়ের মধ্যে মজ্জার মত ওতপ্রোত থাকে। তাই স্বভাব-কবিত্বের স্বতোৎসারিত প্রতিভায় উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়, জটিলতা প্রকাশের জন্য প্রণালী জটিল হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ সারল্যে তারল্যের প্রশ্রয় আসা প্রায় অনিবার্য। এবং বিশেষ ও ঐতিহাসিক কারণেই উপন্যাসের শিল্পরূপ অদ্যাবধি শিল্পকলার যাবতীয় রূপকল্পের মধ্যে জটিল, পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত। উপন্যাস ও জীবনের অবস্থান পাশাপাশি ও ঘনিষ্ঠ, সেজন্য উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একই সঙ্গে আন্বাহিক ও প্রকর্ষের।

সংঘাত, চমক এবং কৌতূহলের সমাবেশে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়, নাটকীয়তার বিশেষ অর্থ তাই, অন্তত নাটকীয় বললে এ-সবগুলি আমাদের স্মরণপথে উদ্ভাসিত হয় অবলীলাক্রমে; উপন্যাসীয় তেমন একটি অর্থদ্যোতক শব্দ, উপন্যাসীয় মানে ক্রমোন্নতি ও বিকাশ, হয়ত এজন্য উপন্যাসের প্রতিমা তত ঋজু নয়, তার গতি শ্লথ ও মন্থর, নাটকের মত ক্ষিপ্র নয় ব'লে এবং চেহারা অনেকটা ঢিলে-ঢালা হওয়ার ফলে অনেকে উপন্যাসের সঙ্গে মহাকাব্যের মিল খুঁজে পান। কিন্তু সে মিল যে নিছক আপাত তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

৫

উপন্যাসের যে-কোনও একটি উপাদান প্রধান নয়, সমস্ত উপাদান-ই নিঃশেষিত হয় সেই অখণ্ড নিটোল প্রকটনে, কিন্তু উপন্যাস যে শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ ও মনন প্রধান তার মূলে হয়ত গদ্যের অবদান নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

পূর্বের আখ্যানমূলক সাহিত্যের বাহন পদ্য নতুন বাস্তবতা উত্থিত মানুষের নতুন জীবনবোধ রূপায়ণে পারংগম হয় নি ব'লেই গদ্যের

প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নিতান্ত তাগিদে, এবং উপন্যাস যে উচ্চতর চিত্রণে নিয়োজিত, বলতে দ্বিধা নেই, সেই বাস্তবতা রূপায়ণের ক্ষমতা পদ্যের নেই। জীবনের বাস্তবের জটিলতা ও উভয়ের কাটাকুটির সম্বন্ধ নিরূপণের অথবা ভারবহনের ক্ষমতা একমাত্র গদ্যের আছে, যেহেতু প্রাত্যহিকের ম্লানস্পর্শ লেগে গদ্যের কাঠামো ঋজু, দৃঢ় অথচ নমনীয়ও বটে, ফলে গদ্যই জীবনের পূর্ণ চিত্র শিল্পায়নের একমাত্র উপযুক্ত মাধ্যম। পদ্য বনাম গদ্যের যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত করা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়, সেজন্য গদ্যের অসংখ্য গুণের মধ্যে কেবল সেইগুলি মাত্র এ-আলোচনায় উল্লেখ্য যেগুলি উপন্যাসের অখণ্ড নিটোলত্ব প্রকাশের সহায়।

গদ্য প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, উপন্যাসে প্রাত্যহিক জীবনের মানুষ মানুষী সচরাচর নির্বাচিত, অতএব সেই চরিত্র বাস্তবায়িত করার পক্ষে গদ্য একমাত্র উপযুক্ত ভাষা। দ্বিতীয়ত, মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তা ও সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্বময় আলেখ্য চিত্রণে সচেতন দৃষ্টির প্রয়োজন, এবং প্রাতিস্বিক ও সামাজিক সত্তার দ্বন্দ্ব-মিলন ব্যাপার নানা সূক্ষ্ম স্থূল ঘটনা, সম্পর্ক, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বুননে জটিল; অথচ জটিলতার কার্যকারণ শৃঙ্খল অনুধাবন বা আবিষ্কার করা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব, এ স্থলে তাঁর হৃদয়াবেগের চেয়ে যুক্তি বুদ্ধি সজাগ ও মনস্ক থাকতে বাধ্য। বলা বাহুল্য যে, গদ্যের অন্যতম গুণ এই যে গদ্য যুক্তি-বুদ্ধি বিসর্জিত শুধুমাত্র হৃদয়াবেগের ভাষা নয়। তাই ঔপন্যাসিকের পক্ষে গদ্যের মাধ্যম গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে; অন্যদিকে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ভাষা ব'লে গদ্যের ছন্দস্পন্দ, যতি প্রভৃতি কখনো নিয়মিত কখনো অনিয়মিত অথবা সামান্য শব্দই বিশেষ পরিস্থিতিতে অসামান্য অর্থবহ, ফলে গদ্যের কাঠামো সর্বদা ঋজু, দৃঢ় নয়, নমনীয়ও বটে। সেজন্য মানসিক আবেগ-উচ্ছ্বাস

প্রকাশের পক্ষে গদ্য প্রচণ্ড বাধা নয়, বরং পদ্যের নিয়ম-শৃঙ্খলে আবেগ উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্র বহুপরিমাণ সংকুচিত হয়।

অর্থাৎ গদ্য একই সঙ্গে মানুষের গোচর অগোচর জীবন প্রকাশে সমর্থ হয় অতি সহজে। শুধুমাত্র সঠিক চিন্তা প্রকাশেরই নয়, যথোপযুক্ত বর্ণনা কেবলমাত্র গদ্যেই সম্ভব। মূর্ত দেশ-কালের প্রকৃতি —তার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রূপ, (উপন্যাসে যা অপরিহার্যরূপে অবশ্যিক) পরিস্ফুটনে গদ্যের যোগ্যতা তর্কাতীত। সর্বোপরি জীবনের সন্নিহিত হওয়ার ফলে জীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশে গদ্য যেমন সক্ষম, তেমনি সক্ষম জীবনের খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনে। দীর্ঘ কবিতা, এডগার অ্যালেন পো-র মতে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার ক্রমিকানুগমন বিশেষ, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কাব্যিক ফলের ক্রমমাত্র।" (দ্য ফিলসফি অব কম্পোজিসন প্রবন্ধ)। কিন্তু গদ্য এমন স্বল্প শ্বাসযুক্ত নয়, এবং উপন্যাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী বা উপন্যাসিকার সমষ্টি নয়। জীবনের তাৎপর্য খণ্ড খণ্ড অংশে জ্ঞেয় নয়, জীবনকে এমন খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করে জীবন-সামগ্র্য লাভ করা সম্ভব কিনা বলা দুষ্কর। তাই অখণ্ড জীবনচিত্র যেখানে কাম্য, সেখানে জীবন সংলগ্ন ভাষারই প্রয়োজন, গদ্য সেই জীবন সংলগ্ন ভাষা।

আবার উপন্যাসের একক (unit) ঘটনা ব'লে ঘটনা নির্মাণের জন্য এমন ভাষার দরকার যে ভাষার শব্দ অবলীলায় বা খেয়াল খুশিতে বদলানো যায় না, সেখানে শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ জানতে হয়, কারণ ঘটনা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট স্থান কালের। কবিতার শব্দের আশ্চর্য সংক্ষেপন বা ঘনীভবনের শক্তি থাকে জন্য কবিতার শব্দের পক্ষে নির্দিষ্ট স্থান-কালের মানচিত্র তুলে ধরা সর্বদা সম্ভব নয়, কবিতার ভাষা তাই যেন হয়ে থাকা সার্বজনীন, অথচ উপন্যাসে সেই লক্ষে উপস্থিত হয়

বিশেষের মধ্য দিয়ে, সেজন্য গদ্যই উপন্যাসের ক্ষেত্রে একমাত্র উপযুক্ত ভাষা।

এতক্ষণ ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আমরা উপন্যাসের নানা উপাদানের মধ্যে গদ্য-কে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী, কিন্তু উপরি-উক্ত আলোচনা প্রাধান্য বিষয়ক আলোচনা নয়, শুধু গদ্য মাধ্যম যে ঔপন্যাসিকের ঈপ্সিত অখণ্ড নিটোল প্রকাশের উপযোগী—সেই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের চেষ্টা মাত্র। উপন্যাসে কোন উপাদান-ই অন্য উপাদান থেকে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ নয় যদিও স্বীকার্য মানুষকে কেন্দ্র ক'রেই উপন্যাস রচিত। কিন্তু এ মানুষ দেশ-কাল বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়, ফলে বিশেষ দেশ-কালে সন্ন্যস্ত মানুষ সম্ভব ও সত্য হয় পরিবেশ, পরিবার, সমাজ, সংসার, ব্যক্তিগত প্রভৃতি নানা সম্পর্কের জটিল যোগাযোগে; সেজন্য উপন্যাসে চরিত্র মুখ্য, না লোকবৃত্তান্ত মুখ্য, না পরিবেশ-চিত্রণ মুখ্য—এ বিষয়ে তর্ক করা চায়ের কাপে ঝড় তোলার সামিল।

আসলে উপন্যাস একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পূর্ণ ঐকতান যেখানে বিভিন্ন তান লয় সমন্বিত নিয়মিত অনিয়মিত সুর মিলে মিশে একটি ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, জীবনেরই ঐকতান উপন্যাস, সেজন্য উপন্যাস জীবন, জীবনের ক্রমোন্নতি ও বিকাশ—মহাজীবন। মহাজীবন এইজন্য যে, ঔপন্যাসিকের যাত্রা বিশেষ জীবন থেকে, সেই বিশেষের মধ্যে দিয়ে সার্বলৌকিক সার্বজনীন ব্যঞ্জনা সঞ্চার উপন্যাসের ফলশ্রুতি। তাই পদ্ধতি বিষয়ে পার্সি লবকের দৃষ্টিকোণ (ঔপন্যাসিক কাহিনীর সঙ্গে কোন সম্পর্কে অবস্থিত, অন্য কথায় আখ্যানভঙ্গী) সংক্রান্ত প্রস্তাব আমাদের কাছে গ্রাহ্য নয়। কারণ সেই প্রশ্নে পরোক্ষভাবে হ'লেও আখ্যানের প্রাধান্য স্বীকৃত। আখ্যানের সঙ্গে সাধারণভাবে লেখক তিন ভাবে অবস্থিত (১. দর্শক হিসাবে ২. সর্বজ্ঞ হিসাবে ৩.

অন্যতম চরিত্র হিসাবে), কিন্তু এই তিন প্রকারের কোনও একটি নির্বাচিত করলেও ঔপন্যাসিকের সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব, কারণ কোনও একটি অবস্থানে জীবন-সামগ্র্য তুলে ধরা যে-কোনও প্রতিভাধরের সাধ্যাতীত, বরং অবস্থা অনুযায়ী, চরিত্রানুযায়ী বা লোকবৃত্তান্ত অনুসারে দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য, এবং কাব্যিক, নাট্যিক কোনও পদ্ধতিই উপন্যাসীয় পদ্ধতিতে অস্বীকৃত নয়। (দ্রষ্টব্য ই, এম ফর্স্টার-এর Aspects of the Novelগ্রন্থ)।

জীবনের ক্রমোন্নতি ও বিকাশের ও সেই সূত্রে জীবন-সামগ্র্য প্রকটনই ঔপন্যাসিকের লক্ষ, সেজন্য উপন্যাসের পদ্ধতি একান্ত ঋজু, দৃঢ়, গণ্ডিবদ্ধ নয়—সেই পদ্ধতিতে শিল্পে-সাহিত্যের অন্যান্য পদ্ধতি অঙ্গীকৃত। অবশ্য যথাযথবাদ (Naturalism), বিম্ববাদ (Impressionism), অন্তঃশীলাবাদ (Expressionism), পরাবাস্তবতাবাদ (Surrealism) যে পন্থাতেই উপন্যাস রচিত হোক না কেন, উপন্যাসীয় পদ্ধতির সাধারণ চরিত্র এ-আলোচনার পূর্বাংশে উক্ত বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি। ভাবা সুখের বিষয় যে, উপন্যাসে যে সব কলাকৌশল একক বা মিশ্রিতভাবে (যথাযথবাদ, বিম্ববাদ ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয় সে কৌশলগুলি বর্ণনাত্মক বিশ্লেষণমূলক, যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ মানুষের জাগর, অ-জাগর, মগ্ন চৈতন্যের অথবা যে-কোনও অবস্থার।

৬

বাস্তব কোনও অনড় অচল স্থিতাবস্থা নয়, সমাজের ক্রমবিকাশ ও গতির ফলে সামাজিক নানা স্তরান্বিত সম্পর্কের হের-ফের হওয়া প্রায় অনিবার্য, যেজন্য বাস্তবের রূপ সামাজিক সচলতার এক এক

অধ্যায়ে এক এক ভাবে দৃশ্যমান হয়। বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধ যেহেতু বাস্তবের উপর নির্ভরশীল, যেহেতু এই বোধ ও জ্ঞান নিঃসন্দেহে পরিবর্তমান, তাই কোনও বিশেষ এক সময়ে সমাজের বিশেষ অবস্থায় আহৃত বাস্তব জ্ঞান ও বোধ সকলক্ষেত্রে কার্যকরী নয়, বরং সে চেতনা ধ্রুব এবং সমস্ত বাস্তবতা বিচারের মানদণ্ড হ'লে অনর্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশী হয়, তাতে ঔপন্যাসিক দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

উপন্যাসের সূচনা স্তরে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রথম কয়েক ধাপে সমাজ অভিযান, আবিষ্কার, দুঃসাহসিকতা, ধ্বংসের, সৃষ্টির উল্লাসে স্পন্দিত ; তখন দিকে দিকে ঘটনার বিস্ফোরণ। হয়ত পুরনো সমাজ ভেঙে যাওয়ার মুখে এবং নতুন সমাজের জন্মমুহূর্তে শৈশব কৈশোরাবস্থায় অগ্রগতির হার কিঞ্চিৎ দ্রুত, এবং সে-সময় কর্মজীবনের নানা দিকের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়, তাই-এ-সময় নতুন নতুন বিস্ফোরণে চোখ ধাঁধানো আশ্চর্যের নয়, সেজন্য ঘটনার প্রতি ঝোঁক পড়া উপন্যাসে স্বাভাবিক।

পুরনো সমাজ বিদীর্ণ ক'রে যে নতুন সমাজের উদয় হয়, সেই নতুন সমাজের মৌলিক বাস্তবতা বিস্ফোরণের মধ্যে সময় সময় উদ্ভাসিত হয়, অন্তত সেই উত্তেজনা উন্মাদনার মুহূর্তে বাস্তবের যথার্থরূপ বহুসময় ঘটনার বিস্ফোরণের মধ্যে বিধৃত থাকে। তাই জীবন-সামগ্র্য প্রকাশের তাড়নায় তখন ঘটনার বিস্ফোরণের আশ্রয় নেওয়া দক্ষতার অবমাননা বা হীনতা নয় ; যদিও স্বীকার্য বহিঃ-ঘটনার অতিরিক্ত চাপে ব্যক্তির ঘটনার ক্রীতদাসে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। এ-আশঙ্কা সত্যও বটে, অথচ সাহিত্যিক-গদ্য তখন যথেষ্ট ভারবহনক্ষম না হওয়ায় মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি মাধ্যমের অপরিপক্কতার জন্য প্রকটিত করা ঔপন্যাসিকের পক্ষে

সাধ্যাতীত হয় ; ফলে একটি ব্যক্তিজীবনের পূর্ণ চিত্র সে-ক্ষেত্রে আশা করা দুরাশামাত্র, যদিও প্রথমযুগের উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের প্রচেষ্টার সততা ও একাগ্রতা প্রশংসনীয়। তবু বলা বাহুল্য নয় যে বাইরের ঘটনার উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দিলে মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মক্ষমতার বিষয়টি বহুলাংশে উহ্য থাকতে বাধ্য।

এই ঘাটতি পূরণের জন্য চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। চরিত্রের উপর ঝোঁক পড়লে মনের অন্ধিসন্ধির সংবাদ নেওয়া ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব হয় নিশ্চয়ই, যেহেতু মানুষের কর্মময় জীবনের সঙ্গে মর্মের সম্পর্ক গভীর ও ঘনিষ্ঠ। ফলে সম্পূর্ণ জীবন চিত্রণের আগ্রহে মনোবিকলনের প্রতি ঝোঁক পড়া স্বাভাবিক। এই ঝোঁক অতিরিক্ত হ'লেই বিপদের আশংকা, যে আশংকা চেতনাপ্রবাহ অথবা স্মৃতিচারণা রীতির অতিরিক্ত প্রয়োগে সমূলক হয়ে ওঠে। তবু মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে ঘটনা-প্রধান উপন্যাসের চেয়ে জীবন-সামগ্র্য তুলে ধরার চেষ্টা অনেকাংশে পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ, কারণ এ-সব উপন্যাসে প্লটের উপর নয়, মানুষের অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ জীবনের বিবরণদানের উপর গুরুত্ব স্থাপিত হয়। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির স্বকীয় মর্যাদা অনেক বেশী স্বীকৃত। অবশ্য এ-কথা সত্য যে মানুষের অন্তর, অন্তর্স্থিত বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ সামাজিক ও ঐতিহাসিক চেতনার সজীব সংযুক্তির বলেই প্রকাশ করা সম্ভব, তাই তলস্তয় বা ব্যালজাকের মত মহৎ ঔপন্যাসিক পদে পদে ব্যক্তির ইতিহাস দেশকালের ব্যাপ্ত ইতিহাসে এবং সমাজ সংসারের অনিবার্য টানে আঁকার প্রয়াসী ছিলেন, তাঁদের কাছে ঘটনা চরিত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, যেহেতু সমাজ ও মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয়ে ঘটনা চরিত্র একই সক্রিয়তার অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত ছিল। ব্যালজাক বা তলস্তয়ের উপন্যাস শিল্পের যে কোনও

বিভাগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য, কিন্তু সেজন্য কি ব্যালজাক বা তলস্তয়ের পদ্ধতি পরবর্তীদের অনুকরণযোগ্য ? এক্ষেত্রে মাইকেল এঞ্জিলো গ্রন্থে রোমা রোঁলা-র উক্তি স্মরণযোগ্য : 'Should great men ever be taken as models in art ? Is not that one of the errors of classical training ? They are examples of energey, sources of force and beauty. It is well to look for a moment on their radiance, then tear ourselves from their contemplation and work." (Page 142. Trans by. Frederick Street. Collier Books.) তা ছাড়া অন্য কারণেও অনুকরণ করা:সম্ভব নয়, যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বাস্তবের পরিবর্তন হয় স্বাভাবিকভাবে, এবং পরিবর্তিত বাস্তবের সমস্যা পূর্ব সমস্যার সদৃশ নয়, ফলে নতুন বাস্তব পরিস্ফুটনের জন্য নতুন কলা-কৌশল অবশ্য অনুসন্ধেয়। ব্রেশ্‌টের ভাষায় "বাস্তববাদ কেবল রূপকল্পের ব্যাপার নয়। এই সব বাস্তববাদীর পদ্ধতি অনুকরণ করলে আমরা নিজেরাই বাস্তববাদী থাকব না।" (ব্রেশ্‌ট অন থিয়েটার, পৃঃ ১১০)। পরবর্তী বাস্তবের স্বরূপ পূর্ববর্তী কলা-কৌশলে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ধনতন্ত্রের প্রগতি-অধ্যায়ের কলা-কৌশল সেজন্য ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ী বাস্তবের চিত্র তুলে ধরতে অক্ষম, জয়েস বা প্রুস্তের অনুসৃত ভঙ্গী এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন কি ধ্রুপদী রীতির শেষ শিল্পী টমাস মানের রীতিও কি বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অনুসৃত কলা-কৌশল ? ধনতন্ত্রের প্রগতি অধ্যায়ে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা উচ্চ প্রশংসিত এবং সমাজের গ্লানি, নিপীড়ন দূর করার চেষ্টায় ব্যক্তির চেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয় ; কিন্তু বর্তমানে সেই ব্যক্তি সমাজ-বিচ্ছিন্ন। এখন সে নিজেই নিজেকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে নানা প্রকার পরীক্ষা-

নিরীক্ষায় মগ্ন, যেন মানুষ ছন্নছাড়া পরিবেশ-পরিজন বর্জিত অনাত্মীয় জগতের বাসিন্দা, যে বিশ্বের পরিধি ও কেন্দ্র হচ্ছে ব্যক্তি স্বয়ং। জয়েসের "ইউলিসিস" অথবা প্রুস্তের "রিমেম্‌ব্রেন্‌স্‌ অব থিংস্‌ পাস্ট" নিঃসন্দেহে অসাধারণ কীর্তি, অন্তত অবক্ষয়ী ধনতন্ত্রে মানুষের বিচ্ছিন্নতার অন্তর্নির্বাসনের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খতার সঙ্গে চিত্রিত, এবং দুজন ঔপন্যাসিকের ব্যবহৃত রীতি উপন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য সম্প্রসারণের নিদর্শন, কিন্তু এ-সব রীতির সীমাবদ্ধতার কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়, অন্তত জয়েসের চেতনা-প্রবাহ রীতিতে সমসাময়িক ও পরবর্তী যেসব ঔপন্যাসিক প্রভাবিত, তাঁদের রচনাবলীতে সে কথা-ই সুস্পষ্ট। বোধ হয় একান্ত অন্তর্মুখী বা নিউরোটিক চরিত্র চিত্রণে চেতনা-প্রবাহ পদ্ধতি যথোপযুক্ত—হয়ত স্বাভাবিক চরিত্রে যখন জাগর ও স্বপ্ন একাকার তখনও চেতনা-প্রবাহ বা স্মৃতিচারণ পদ্ধতির উপযোগিতা বর্তমান, তাই এ-পদ্ধতি নতুন বাস্তবতা উত্থিত জীবন চিত্রণে জীবনের বাস্তবের সামগ্রিক চিত্র রচনায় যথেষ্ট এবং সর্বাত্মক নয়, সেজন্য ঔপন্যাসিকেরা নিশ্চয় চিন্তিত, হয়ত সেই চিন্তার ফল ডস্‌পাসোস্‌-এর 'ইউ. এস. এ' উপন্যাসে ব্যবহৃত রীতি-র মধ্যে লক্ষণীয়, জয়েস-এ যে রীতির জন্ম সেই রীতির দোষ ত্রুটি মোচনের চেষ্টায় 'ক্যামেরা আই', 'নিউজ রিল' এবং সরাসরি বিবরণ দানের ইচ্ছায় এ কথা স্পষ্ট যে ডস্‌পাসোস্‌ তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বাস্তবের জীবনের সমগ্র চিত্র ধরার প্রয়াসী ছিলেন। আবার অন্যদিকে টমাস মান সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রায় মার্গ সঙ্গীতের মন্থরতায় নব্যধ্রুপদী পন্থায় নতুন বাস্তবতা অঙ্কনে সচেষ্ট। টমাস মানের জগৎ নিশ্চয়ই "যুদ্ধ ও শান্তি"র মত বিশাল বিরাট নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য নিবাসের গণ্ডিতে অথবা সঙ্গীতজ্ঞের জীবনালেখ্যে মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের একনায়কতন্ত্রের যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রূপ

তুলে ধরায় তিনি সক্ষম ও সফল হয়েছেন উপন্যাসের প্রতীকি তাৎপর্যে, সেই প্রতীকে ভবিষ্যতের অনুরণন প্রায় অশ্রুত হ'লেও তার স্পন্দন সতর্ক পাঠে অনুভূত হয়। আবার বাস্তবের নতুন রূপ কাফ্‌কার অপূর্ব ভঙ্গীতে (বাস্তব ও রূপকের একাকার) প্রোজ্জ্বল, যেমন ফকনরের দীর্ঘ জটিল বাক্য বিন্যাসে তার স্বরূপ ধরার নিদর্শন, অথবা হেমিঙ্গওয়ের ছোট ছোট প্রায় আবেগ বর্জিত বিবৃতিমূলক ভঙ্গি ও সংলাপে, বা তার আগে ডস্টয়েভস্কি যেমন শহরের বাস্তবতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেন অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে। অতি নাটকীয়র অতিরিক্ত প্রয়োগও যে মহান শিল্পে রূপ নিতে পারে তা জানা গেল ডস্টয়েভস্কির ভয়ঙ্কর সব উপন্যাসে, তিনি একটা অচল ও দুর্বল রীতি-কে মহনীয় করে তুললেন নতুন শাহরিক বাস্তবতার রূপায়ণে, অবশ্যই সেই অচল ও দুর্বল অতি নাটকীয়তায় আনলেন নতুন মাত্রা নতুন বাস্তবতা ধরার জন্য।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে টমাস মান, কাফকা, হেমিঙ্গওয়ে বা ফকনারের রীতি একমাত্র গ্রহণীয় পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের কাছে, আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে সমাজ ও মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয়ে নতুন বাস্তবতা উত্থিত জীবন চিত্র তুলে ধরার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্তমান, এবং যাঁর বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তববোধ তীব্র ও তীক্ষ্ণ তিনিই উপযুক্ত আধেয় আধারের মিলন ঘটাতে সক্ষম। তাই যে সব ঔপন্যাসিক জীবনের খণ্ডাংশে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদের মত জীবন সামগ্র্যর স্পন্দন সৃষ্টিতে পারদর্শী তাঁরাও কম মহৎ ন'ন, তাঁদের কীর্তিও বোধ হয় কোনও বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। স্তাঁদাল, ডস্টয়েভস্কি, হারমান মেলভিল, ফিল্ডিং প্রভৃতি দিক্‌পালের উপন্যাসে জীবন-সামগ্র্যই উদ্ভাসিত আত্মহননের আত্ম-বিস্তারের অথবা কাহিনী চরিত্র পরিবেশের অপূর্ব ব্যঞ্জনায়।

জয়েস, প্রুস্তের "ইউলিসিস," "রিমেম্‌ব্রেনস্‌ অব থিংস্‌ পাস্ট" উপন্যাস শিল্পের গৌরব বিশেষ। ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক নতুন বাস্তবতা উত্থিত নতুন সমস্যাবলীর স্বরূপ ও প্রকৃতি আবিষ্কারে নিশ্চয়ই পূর্বসূরীদের অনুসৃত কৌশল ও রীতি অনুশীলন ও আত্মসাৎ ক'রে নতুন কৌশল ও রীতি আবিষ্কারে উপকৃত হতে বাধ্য, কারণ পুনরাবৃত্তিতে নয়, নতুন মুল্যায়ন ও নতুন ভঙ্গীতে একমাত্র পরিবর্তিত মূল্যবোধ, জীবনের নতুন সমস্যাবলী প্রকাশিত হয়। সেজন্য কলা-কৌশলগত কোনও নির্দিষ্ট ছক অথবা সূত্র দিতে আমরা অপারগ, আমরা শুধু বক্রোক্তি জীবিতকারের মত বলতে সক্ষম "কবিস্বভাব-ভেদ-নিবন্ধনত্বেন কাব্যপ্রস্থানভেদঃ" [১।২৪ বৃত্তি, কবিস্বভাবের ভেদে কাব্যরীতি পৃথক হয়] এবং সেই প্রস্থান ভেদে জীবন সামগ্র্য স্পন্দিত হ'লেই আমরা আনন্দিত ও সন্তুষ্ট।

৭

"যে লেখকের বিশ্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার, নির্দিষ্ট ও টাটকা ধারণা নেই, এবং বিশেষতঃ যে লেখক এ-ধারণাকে প্রয়োজনীয় মনে করেন না, তিনি কখনো শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন না।" (নভেলিস্টস্‌ অন দ্য নভেল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৩১)। তলস্তয়ের অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত, আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক সৎ ও প্রকৃত শিল্পই সচেতন প্রয়াসের ফল। হয়ত লেখার সময় পরিকল্পনার হুবহু রূপায়ণ অসম্ভব, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অদল-বদল হয় স্বাভাবিক নিয়মের অধীন, তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, লঘু-তরল চপল মনের খেয়াল খুশী চরিতার্থ করার উদার ক্ষেত্র শিল্প-সাহিত্য নয়, এখানে শিল্প-সাহিত্যের অর্থ

যথার্থ ও সৎ শিল্প-সাহিত্য। বিশেষতঃ উপন্যাসের পরিধি বহু বিস্তৃত, এবং কেন্দ্র সুদূর অতলতায় স্থিত ব'লে ঔপন্যাসিকের পক্ষে পরিকল্পনা বা পরিকল্পনার ছক আঁকা অতি আবশ্যিক। এর অর্থ এই নয় যে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হুবহু কর্ম সম্পাদনা করাই কেবল লেখকের কর্তব্য। ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব এর চেয়ে নিঃসন্দেহে গভীর ও অর্থময়। উপন্যাসে দেশ কাল ও মানুষ সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশী মূর্ত ও বাস্তবের সংলগ্ন ব'লে লেখকের সুবিধা ও অসুবিধা প্রায় সম মাত্রার, তাই বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য যেমন তিনি পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য, তেমনি জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার থাকা বাঞ্ছনীয়। এবং পরিকল্পনা ও পরিষ্কার ধারণা এক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গী।

শিল্পের বক্তব্য রূপায়ণের জন্য শিল্প সৃষ্টি, প্রতি মহৎ শিল্পীর লক্ষণ তাই এবং বক্তব্যের টানেই শিল্পের বিভিন্ন উপাদান একটি ঐক্যে সংস্থাপিত হয়; সেজন্য স্থানিক বা চারিত্রিক ঐক্য বিশেষ জরুরী নয়, অন্তত উপন্যাসের ক্ষেত্রে তো নয়ই, কারণ স্থান কাল পাত্রের স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব উপন্যাসে অভাবনীয়, যেহেতু উপন্যাসের সামগ্রিক শিল্পরূপে স্থান কাল পাত্র অবিচ্ছিন্ন ওতপ্রোত থাকে উপন্যাসীয় নিয়মে। উপন্যাসীয় নিয়ম মানে ক্রমোন্নতি ও বিকাশের সূত্রে কার্যকারণমালায় অনিবার্য পরিণতিসমূহ। ফলে লেখকের আগ বাড়িয়ে কিছু বলা, অথবা চরিত্র, লোকবৃত্তান্ত প্রভৃতির স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করা উপন্যাসীয় নিয়ম লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই বক্তব্য রূপায়ণে ঔপন্যাসিকের অতি সতর্ক থাকা উচিত, এবং এ-কথা সকলের বোধগম্য যে, বক্তব্য শৈল্পিক উদ্দেশ্য ও শৈল্পিক রূপায়ণের সহায়ক না হ'লে তা আর যাই হোক

উপন্যাস নয়। অন্য কথায় লেখকের বক্তব্য চরিত্র লোকবৃত্তান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে পরিস্ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং এ প্রক্রিয়া যত বেশী কার্যকরী হয় উপন্যাসের সাফল্য তদনুপাতিক হবে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বক্তব্য এবং বক্তব্য-রূপায়ণের ইচ্ছায় পূর্ব কথিত কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ শক্তির দ্বন্দ্বময়তাই পরিলক্ষিত। বক্তব্যের কেন্দ্রের দিকে সতত আকর্ষণ এবং রূপায়ণের কেন্দ্র ত্যাগ করে বেরিয়ে যাওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা—আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু'টি শক্তি মনে হ'লেও এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ একই সক্রিয়তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেজন্য উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রশ্ন নয়, উপন্যাসের প্রক্রিয়ায় উভয়ের দ্বন্দ্বময়তাই লেখকের লক্ষণীয়, এবং দ্বন্দ্ব-উত্থিত সমস্যার সমাধান আবিষ্কারের চেষ্টা ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত ও লক্ষ।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বক্তব্য রূপায়ণই যদি লেখকের উদ্দেশ্য তবে উপন্যাসে জীবন সামগ্র্য তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা কি? লেখকের বক্তব্য জীবনকে দেখার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, সেজন্য যে কোনও দৃষ্টিভঙ্গী জীবন সামগ্র্য তুলে ধরতে অক্ষম, কারণ জীবনের সতত চলিষ্ণু সজীবতা ফ্রেমে আঁটা দৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব, অথচ লেখক একটি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েই জীবনকে দেখতে বাধ্য। এই দৃষ্টির ব্যাপ্তি, বিস্তার ও গভীরতা যত বেশী লেখকের সাফল্য তত বেশী। বলা বাহুল্য ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ বাস্তবজ্ঞান ও বোধের উপর দৃষ্টির ব্যাপ্তি, বিস্তার ও গভীরতা নির্ভরশীল। তাই জীবন সামগ্র্য প্রকাশের তাৎপর্যে বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তববোধের ভূমিকা সক্রিয় থাকে সর্বদা।

এক্ষেত্রে শেক্স্‌পিঅরের উদাহরণ বোধ হয় অ-প্রসাঙ্গিক নয়। শেক্স্‌পিঅরের রচনাবলী থেকে জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী

বা জীবন-দর্শন আহরণের চেষ্টা প্রায় সাধ্যাতীত, কারণ সেই মহান শিল্পীর দৃষ্টিতে একই সঙ্গে অগ্রগতি ও প্রত্যাগতির ঝোঁক লক্ষণীয়। সেজন্য শেক্‌স্‌পিঅরের মূল বা প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী কি—এ সম্পর্কে বর্তমান সমালোচক তো বটেই এমন কি রথী মহারথিগণও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তবে কি শেক্‌স্‌পিঅরের নাটকাবলীতে কোনও জীবন-দর্শন প্রতিফলিত নয়? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বর্তমান সমালোচকের মত অভাজনের পক্ষে দুঃসাধ্য। শেক্‌স্‌পিঅরের সমগ্র নাটক একটি সফল সার্থক ঐকতান, যার ভিন্ন ভিন্ন সুর এক একটি নাটক। সেই ভিন্ন ভিন্ন সুর জীবনের বিভিন্ন আশা-নিরাশা, হতাশা, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ, প্রেম, ঘৃণা ইত্যাদি, আর তাঁর তাবৎ নাটকাবলী একত্রে জীবন, মহাজীবন-ই বলা শ্রেয়। যেমন মহাজীবন উদ্ভাসিত তলস্তয়ের "যুদ্ধ এবং শান্তি" উপন্যাসে। একটি গ্রন্থের পরিধিতে জীবন সামগ্র্য চিত্রিত করার সুবিধা একমাত্র ঔপন্যাসিকের করায়ত্ত, তাই সেদিক থেকে "যুদ্ধ এবং শান্তি" পূর্ণাঙ্গ পরিণত উপন্যাস শিল্পের বিশেষ নিয়মে।

শেক্‌স্‌পিঅরের নাটকের মহত্ত্ব অনুধাবনে অবশ্য পাঠকের প্রেক্ষকের কল্পনা-প্রতিভার ভূমিকা নেহাৎ তুচ্ছ নয়, নাটকের আভাস ইঙ্গিতে প্রতিফলিত জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংবেদন আস্বাদনের ক্ষমতা পাঠক প্রেক্ষকের না থাকলে বলা বাহুল্য সেই মহত্ত্ব বিচার অসম্ভব। পক্ষান্তরে তলস্তয়ের "যুদ্ধ এবং শান্তি" পাঠের সময় পাঠকের গ্রহণ ক্ষমতা যথেষ্ট ন্যূন হ'লেও ক্ষতি নেই, কারণ ঔপন্যাসিক তলস্তয় পাঠকের বন্ধু, দার্শনিক এবং পরিচালক; সেখানে পাঠকের কল্পনা-প্রতিভার ক্ষেত্র নিতান্ত সঙ্কুচিত, সেদিক থেকে ঔপন্যাসিকের শিল্পকর্মে আরও দক্ষতার প্রয়োজন। তবু তলস্তয়ের "যুদ্ধ এবং শান্তি" উপন্যাসে, শেক্‌স্‌পিঅরের নাটকের

মত, জীবন-দর্শন খোঁজা বোধ হয় নিরর্থক। সেই মহারচনায় জীবন মহাজীবন-ই আন্দোলিত রাশিয়ার আকাশে বাতাসে জলে স্থলে। বাস্তব জ্ঞান ও বোধের শক্তিতে এবং জীবন সন্ন্যস্ত হওয়ায় ভবিষ্যতে কম্প্রমান সম্ভাবনা তলস্তয়ের বিরাট উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত, এবং এইখানেই শিল্পী অপরাজেয়। আসলে শিল্পের যথার্থমূল্য লেখকের অতি সচেতন মতাদর্শ পরিবেশন অথবা উপদেশমূলক আশাব্যঞ্জক বিরাট বিরাট বাক্যজাল বিস্তারের মধ্যে নিহিত নয়, বিশেষতঃ উপন্যাসে উপন্যাসের অখণ্ড নিটোলত্বের মধ্যে সমগ্র জটিলতা সমেত জীবন কতখানি সমৃদ্ধ মূর্ত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তার মানদণ্ডে উপন্যাসের প্রকৃত শিল্প মূল্য বিচারণীয়। অমূর্ত বাণীর নির্ভুলতা বা আরোপিত বক্তব্যের জবরদস্তি সেজন্য উপন্যাসে অচল এবং শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর, যেহেতু এর মধ্যে লেখকের বাস্তব জ্ঞান ও বোধের অভাবই প্রকট থাকে।

তবে কি জীবন সামগ্র্য তুলে ধরার প্রয়োজন উপন্যাসে নেই? নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কারণ একমাত্র জীবন সামগ্র্য তুলে ধরার চেষ্টায় সমস্ত জটিলতা সমেত জীবনের সম্পদ ও অনন্ত সম্ভাবনা মূর্ত করা সম্ভব। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যার সমাধান হয়ত বর্তমানে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান, ঔপন্যাসিক বাস্তব জ্ঞান ও বোধের যথার্থ শক্তির বলে সেইসব সমস্যার সমাধান বা সমাধানের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম উপন্যাসের শিল্পিত আবেগে, এবং এইখানেই ঔপন্যাসিক একটি বিশেষ দেশ-কালের বাসিন্দা হয়েও সেই দেশ-কালের সীমা অতিক্রমে পারংগম হন।

ডি, এইচ, লরেন্সের উক্তির সঙ্গে আমরা একমত ব'লে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ ঘোষণা দিয়ে আমাদের আলোচনার সমাপ্তি টানা স্বাভাবিক: "আমি একজন মানুষ, এবং প্রাণবন্ত। আমি একজন

সজীব মানুষ, এবং যতদিন পারি সজীব মানুষ হিসাবে জীবন কাটাতে ইচ্ছুক। এই কারণে আমি একজন ঔপন্যাসিক। এবং ঔপন্যাসিক ব'লেই সন্ত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং কবির চেয়ে আমি নিজেকে বড় মনে করি। এঁরা সকলেই সজীব মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দিকের শ্রেষ্ঠ রূপকার, কিন্তু এঁরা কেউ-ই কখনো মানুষ-কে সম্পূর্ণভাবে পায় না।"

ঐতিহ্য-প্রগতি তারাশঙ্করের উপন্যাস

ঐতিহ্য ও প্রগতির দ্বন্দ্বে তারাশঙ্করের টান হয়ত ছিল ঐতিহ্যের দিকে, হয়ত—কারণ তিনি পরিবর্তনও চেয়েছিলেন, কিন্তু তুলাদণ্ডের পাল্লাটা ঝুঁকেছিল প্রথম দিকে। যদিও স্বীকার্য, চলমান ঐতিহ্যের সঠিক আত্তীকরণেই প্রগতি সম্ভব—ঐতিহ্য ও প্রগতির সম্পর্ক তাই ঐকিক নিয়মের মতো সরল নয়। আমরা ঐতিহ্য ও সনাতনত্বকে এক ভাবি ব'লে আমাদের ঝোঁক এতই একপেশে হয় যেন ঐতিহ্য ও প্রগতি একে অপরের প্রতিযোগী, অবশ্য ঐতিহ্যের মধ্যে পিছুটানের অনুপাত তুচ্ছ নয়, বিশেষত আমাদের দেশে ঐতিহ্য অতীত-কাতরতার একটা ভিন্ন নাম হয়ে ওঠে। স্মৃতি-রোমন্থন সুখের সন্দেহ নেই, কারণ স্মৃতি অধিকাংশ সময়ে অতিরঞ্জনে সিক্ত, তাই পরিবর্তনের মুখে আমাদের দ্বিধা আসা স্বাভাবিক। ফলে অবশেষে ঐতিহ্য ও প্রগতি এদেশে প্রায় প্রতিযোগী শক্তি হিসেবে পরস্পরের মুখোমুখি হ'লে বেশির ভাগ লোক অ-পরিবর্তনের, স্থবিরতার পক্ষে প্রাথমিকভাবে যাবে ব'লে মনে হয়। অন্তত গত ও বর্তমান শতাব্দীর নানা আন্দোলনের প্রবক্তাদের মধ্যে যে-পরিমাণ স্ববিরোধিতা লক্ষ করা গেছে তার সূত্রে সেকথা বলা চলে। অবশ্য এজন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রকোপ অনেকখানি দায়ী।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন 'এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই', তখন তিনি সমস্যার মর্ম স্পর্শ করেন অতি অনায়াসে। বুঝি যে ঐ বিজাতীয় শিক্ষার ফলে আমরা আমাদের চলমান

ঐতিহ্যের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে গভীর গাড্ডায় গিয়ে পড়েছি, যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। উপরন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ব্রিটিশ শিল্প ও বাণিজ্যনীতির ফলে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সমূলে ধ্বংস হয়েছে, ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় মর্মান্তিক।

গ্রামকে শোষণ ক'রে বেড়ে ওঠে শহর, অথচ উভয়ের মধ্যে সাধারণ যোগের সূত্র পর্যন্ত ছিন্ন। তাই পরিবর্তনের ঢেউ এড়িয়ে গ্রাম হয়ে ওঠে অনড় অচল, সেখানে বাসা বাঁধে, আধুনিক শিক্ষার অভাবে, হয়ত তার প্রতিক্রিয়ায়, যত সংস্কার-জীর্ণ আচার ব্যবহার। অন্যদিকে শহরে পরিবর্তন কিছু দ্রুত হ'তে থাকলে ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক বাবু-সভ্যতার কূপমাণ্ডুক্যে শহরকে সর্বৈব ভেবে বুঝতেই পারলেন না যে এভাবে দেশের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হ'লে সমস্ত রক্ত মুখে জড়ো হওয়ার মতো তা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। অর্থাৎ আমাদের শহর ও গ্রামবাসী উভয়েই কিছুটা পরিবর্তন ও অন্যদিকে অ-পরিবর্তনকে প্রগতি ও ঐতিহ্য ভেবে দুই চূড়ান্ত প্রান্তে অবস্থান ক'রে দুই 'বাসী' তত্ত্বের (শহর ও গ্রামবাসী) পরিপোষক হয়ে ওঠেন। তাই পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টা মাঝে মধ্যে হ'লেও যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয় না স্বাভাবিকভাবে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে তথাকথিত শিক্ষার অভিমানে আমরা বুঝলামই না যে আমাদের শহুরে আবহাওয়া বিশুদ্ধ শহুরে নয়, কারণ যে কৌশলেই হোক না কেন আমাদের উঠ্‌তি ধনতন্ত্র ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না ক'রে তাকে কোল দিল সস্নেহে। এতে শাসকদের যে প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র ছিল, সে বিষয়ে যোগ্য আলোচকগণ বহু আলোচনা করেছেন। আমরা শুধু এইটুকু ইঙ্গিত দিতে পারি যে আমাদের শহুরে মনে গ্রাম্যতা গেড়ে বসেছিল অচেতনে। আর তাই আমরা

আধা শহুরে আধা গ্রাম্য মন নিয়ে সমস্যার স্বরূপ ধরা তো দূরের কথা, সমস্যাটিকে সমাধান ভেবে দেশের উন্নতি সম্পর্কে নরম গরম বক্তৃতা দিয়েছি। সে ভ্রান্তি এখনও কাটে নি। নইলে এখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে যখন এদেশে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়েছে তখন যদি হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় যে এইসব একচেটিয়া পুঁজিপতির কেউ কেউ দেশের সবচেয়ে বড় জমিদারও বটে, তখন অবাক না হয়ে উপায় কি! এই সামান্য অথচ ভয়ঙ্কর তথ্যটি জানায় যে দেশের সমগ্র উন্নতি ও বিকাশের চেহারাটি অষ্টাবক্র।

উপরন্তু আছে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে অসম উন্নয়নের সমস্যা। তারই ফলে এবং অন্যান্য কারণে অবশেষে দেখা দিয়েছে পরস্পরের মধ্যে উচ্চতা ও হীনতার ভাব। প্রগতির দৌড়ে বাঙালি ভদ্রলোক বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে কিছু আগাম পেয়ে যে উচ্চমন্যতার জোয়ারে ভাসেন, তাতে ভাটার টান দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে।

ততক্ষণে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। অন্যদিকে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হবার ফলে ক্ষমতা দ্রুত অ-হিন্দু এবং অ-ভদ্রলোকের হাতে চ'লে যাবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, এমন কি অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাতে রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ও বাংলাদেশ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। এই রকম অবস্থায় বাঙালি ভদ্রলোক পিছু-হটার পালায় অতীতাচারী ও স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়বে, আর এই প্রক্রিয়ায় তার অন্তর্নিহিত পিছুটান প্রবল হ'য়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

এর থেকে পরিত্রাণের উপায় নিশ্চয় ছিল আন্দোলনের মধ্যে। তবে সীমিতভাবে বাবুদের দৃষ্টি শহর ও গ্রামের মর্মান্তিক বিচ্ছেদের দিকে আকৃষ্ট হ'লে হয়ত আমাদের ট্র্যাজেডি এত গভীর হতো না।

অবশ্য 'যদি' 'হয়ত' ইত্যাদি ইতিহাসের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে না। আসলে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সদর্থক বস্তু বাস্তব অবস্থার সমানুপাতিক ছিল না। শাসকশ্রেণীর চাল অনুযায়ী আমরা শুধু বোড়ে ঠেলেছি, সেই বোড়ে ঠেলা স্বাধীনতা-সংগ্রামের সামগ্রিক কৌশলের অঙ্গীভূত ছিল—এমন কথা বলা চলে না। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, রুশ বিপ্লবের পর থেকে আমাদের দেশের নিপীড়িত জনতার মধ্যে চেতনার ঢেউ কলতান তুলেছে। কলকারখানা বা কৃষিতে যে চাঞ্চল্য জাগছিল, সেই চাঞ্চল্যকে সঠিকভাবে কর্মসূচির অন্তর্গত ক'রে কাজে পরিণত করার ব্যাপারে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক দল এমন কি উঠ্তি বামপন্থী দলও বিজ্ঞতার পরিচয় দেয় নি সব সময়। অথচ এ-ও ছিল এক অমোঘ কৌশল। বরং আন্দোলনগুলি মধ্যবিত্ত উচ্চাশা মেটানোর হাতিয়ার হওয়ায় আমরা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ি সংখ্যাগরিষ্ঠের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে—আমাদের মধ্যে হতাশা জাগে চূড়ান্তভাবে।

অন্যদিকে আমরা দেশ ও সমাজের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি নি, ফলে সমাজ ও ধর্মের কিছু কিছু সংস্কার-আন্দোলনকে সমাজ বদলের নিরিখ হিসেবে দেখে সমস্তই তালগোল পাকাই। এমন কি সেই সংস্কার বা সংস্কারের ইচ্ছাসমূহ গোটা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে অক্ষম হয়েছি। ঐতিহ্য ও প্রগতির কথায় তাই স্মৃতি কাতরতা, সনাতনত্ব-র বিষয় ওঠে সংগতভাবে, যেহেতু এই দুটি বাস্তব কারণে ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে যায় বারবার।

দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ সে বিতর্কে না ঢু'কে বলা চ'লে যে রাজনীতিতে দেশের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত না হ'লে সে দেশের কপাল মন্দ হয় নিশ্চিতভাবে। এবং দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে আমাদের রাজনীতিতে দেশের

বাস্তব অবস্থা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় নি। হয়ত কোনো কোনো সময় আংশিক প্রতিফলনে তা স্পষ্ট হ'লেও গোটা লক্ষ তার সংগ্রামিক কৌশল বা আদর্শগত বিষয় ঐ অংশেও ধরা পড়ে নি সর্বদা। এর উপরে আছে বিষয়কে কাজে রূপায়িত করার অক্ষমতা। চিন্তার এই অস্বচ্ছতা এবং চিন্তাকে কর্মে রূপায়ণের অক্ষমতা, অন্যদিকে আবার তা-ই ঐতিহ্য ও প্রগতির লড়াই-এ পরোক্ষভাবে অচল ঐতিহ্যের খুঁটি শক্ত করে। কারণ প্রকৃত অবস্থার পরিপোষক রাজনৈতিক সচলতা একই সঙ্গে ঐতিহ্য ও প্রগতিকে তার আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে এবং রাজনীতি তখন জীবনবিচ্ছিন্ন কোনো শৌখিন ব্যাপার হয়ে ওঠে না।

রাজনীতির দুর্বলতার চিহ্নগুলি আমাদের সাহিত্যেও চোখে পড়ে সহজে এবং রাজনীতির ব্যাপারটা দুর্বল হওয়ার জন্যই বোধ হয় রাজনীতি সাহিত্যে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারে নি। বাংলাসাহিত্য ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্তের কুক্ষিগত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখকে সাহিত্য পরিস্ফুট করতে পারে নি। উপন্যাস জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প, মানুষই এর মূল এবং একমাত্র কেন্দ্র। তদুপরি শিল্পের এই বিভাগ জীবন সামগ্র্য ধরতে চায় দেশ কালের বিশিষ্ট পটে—ব্যক্তিমানুষের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজ, সেই সমাজের সচলতা, তার বৈষয়িক সাংস্কৃতিক সমেত সমস্ত দিক। সেই জন্য বোধ হয় উপন্যাস মহাকাব্যের সঙ্গে উপমিত হয়। তাই সংখ্যা-গরিষ্ঠের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করা তার সাজে না।

অবশ্য একথা ঠিক যে সব সময় সব সাহিত্যে একটি বিশেষ বিভাগের স্বর্ণযুগ থাকে না, অথবা কোনো কোনো সাহিত্য শুধু একটি বিভাগের প্রতি পক্ষপাত দেখায় বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে। বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও ছোটগল্পের ক্ষেত্র যেমন উর্বর, উপন্যাস সে রকম

জমি এখনো পায় নি নিশ্চয়। কিন্তু আক্ষেপ করা এক এবং জমির উর্বরতা বাড়ানোর চেষ্টা অন্য কথা। বাংলা উপন্যাসকে তেমন উর্বর ভূমিতে রূপান্তরের চেষ্টা খুবই কম হয়েছে। আসলে সেখানে আমাদের রাজনীতিজ্ঞদের মতোই বাঙালি ঔপন্যাসিক বাস্তবের চেহারা ধরতে পারেন নি। হ'লে বিশাল জনসমষ্টি ও সেই সমাজ উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হতো নানা উপন্যাসে। আর বাংলা উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ উপেক্ষিত হ'লে থাকে শুধু আমার আপনার মতো ছিন্নমূল ভদ্রলোকের আত্মকণ্ডূয়ন, কারণ নাগরিক সমাজও আমাদের উপন্যাসে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কদাচিৎ। ফলে সেই আত্মকণ্ডূয়ন বা ড্রইং-রুমচারী ভুঁইফোঁড় দিয়ে সার্থক উপন্যাস লেখা যথার্থ দুঃসাধ্য।

শিক্ষার অভিমানে আমরা বাবুসভ্যতার পরিধির বাইরের সব কিছু পরিহাস না করলেও যথেষ্ট আমল দিই নি, সেজন্য বিশাল বাংলাসাহিত্যের আধুনিক প্রাঙ্গণে গ্রামজীবন অনুপস্থিত থাকে। বোধ হয় শরৎচন্দ্র উপন্যাসে তবু পল্লী-সমাজের গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখায় গোটা পল্লীসমাজ ধরা পড়ে নি—যেটুকু ধরা পড়েছে সে অংশেও ঔপন্যাসিকের মননের বদলে ভাবালুতা প্রকট। এবং শরৎচন্দ্র তাঁর কতিপয় জনপ্রিয় উপন্যাসে গ্রামকে স্থান হিসাবে নির্বাচিত করলেও গ্রাম সেইসব গ্রন্থে চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত না হ'য়ে শুধু পটভূমিকার কাজ করে। ঐ সব উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা আসলে মধ্যবিত্তেরই ছদ্মবেশ, তা বলা বাহুল্য। হয়ত এই জন্যই আপাত বিদ্রোহের অন্তরালে রক্ষণশীল হয়েও শরৎচন্দ্র বিদ্রোহী ও অপরাজিত আখ্যায় ভূষিত হন[১]। আর শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা

---

১. বর্তমান লেখকের 'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

যেসব গুণের জন্য, সেই সকল গুণ পরবর্তী কয়েকজন ঔপন্যাসিক অনুকরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, কারণ তাঁদের শরৎচন্দ্রের মতো দরদ ছিল না।

এই সব অনুকারকদের উপন্যাসে গ্রামবাংলা যেটুকু এসেছে তার সঙ্গে একজন 'টুরিস্টে'র দেখা ছবির প্রভেদ যৎসামান্য। এবং 'টুরিস্ট' -চোখে যে যথার্থ উপন্যাস লেখা যায় না, তা সকলেরই জানা। এর চেয়ে বরং আমাদের সাহিত্যিকরা অনেক বেশি উচ্ছল হয়েছেন বিদেশী আদলে সাহিত্য রচনায়। অন্তত বিদেশী সাহিত্যের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোয় বাংলা উপন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য আসে। তবু রচনাগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এই জন্য যে আধুনিক সাহিত্যিক বিদেশী ভঙ্গি নিছক অনুসরণ ক'রে ঐ সব লেখকের সাফল্যের চাবিকাঠি কোথায় তা হৃদয়ঙ্গম করেন নি; কল্লোল কালিকলম প্রভৃতি কাগজে তার নিদর্শন প্রচুর আছে। বিদেশী মূলধন স্বদেশের জমিতে লগ্নি করতে গেলে স্বদেশকে নিশ্চিতভাবে না জানলে চলে না যেমন, ঠিক তেমনি কোনো বিদেশী সাহিত্যের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি দেশীয় সাহিত্যে ব্যবহার করতে গেলে উপযুক্ত জমি প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেশকালের পটে জাতীয় মানসে সুসন্যস্ত করতে হয়, নইলে কৃত্রিম পণ্যে বাজার ছেয়ে গেলে দক্ষ কারিগরও মার খায়। অবশ্য কল্লোলীয় ভাবনাচিন্তার পাশে আর একটি স্রোত ছিল, যে স্রোতে শরৎচন্দ্র ও কল্লোলের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়েছিল ন্যায্যত, কিন্তু ক্ষীণভাবে।

তারাশঙ্করের কৃতিত্ব এইখানে যে বাংলাসাহিত্য যখন ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রলোকের বিলাসী রচনায় মেতে উঠেছিল, তখন তিনি গ্রাম্য অশিক্ষিত প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হবার ভয়ে ভীত না হ'য়ে পাঠকদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন—যেখানে তখন পুরনো

জীবনধারায় নবীনের অভিঘাত শুরু হয়েছে, যা আমরা কোনোদিন চোখ মেলে দেখি নি। ঐতিহ্যমুখী পল্লীসমাজ ক্রমে বাইরের আঘাতে পরিবর্তনের মুখে বা পরিবর্তিত হ'তে চলেছে, যদিও সেই পরিবর্তনের চিহ্ন অনেকদিন ধ'রে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু সেই পরিবর্তন আমাদের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ার মতো নয়। তারাশঙ্কর সেই পরিবর্তনের কাহিনী উপজীব্য করলেন তাঁর উপন্যাসে, সেজন্য তাঁর ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও প্রগতির প্রশ্ন ওঠে স্বাভাবিকভাবে।

অন্যপক্ষে গ্রামীণ সমাজের সচলতার বিষয় তাঁর উপজীব্য হয় ব'লে তিনি বাংলা সাহিত্যে কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে উপন্যাসের যথার্থ বিষয় পেয়ে যান অবলীলাক্রমে। তারাশঙ্কর যখন লেখেন, 'এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহসমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু'চোখ ভ'রে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল,' (আমার কালের কথা, ২য় সং, পৃ ১২) তখন সেই কথা প্রমাণিত হয়। উপন্যাস তো শুধু গল্প বা কাহিনী রচনা নয়, গল্প বা কাহিনীর স্থিতিধর্মিতা ছাড়িয়ে ঔপন্যাসিক জীবনসামগ্র্যের গতি-ধর্মিতাকে তুলে ধরেন। এই চলৎশক্তি-ই হচ্ছে উপন্যাসের প্রাণ, কারণ মানুষের জীবন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে না, তা ক্রমাগত নানা দ্বন্দ্বসংঘাতে বিকশিত হ'তে থাকে। অথচ মানুষের বিকাশ সমাজ নিরপেক্ষ কোনো নির্বস্তুক ব্যাপার নয়, কারণ ব্যষ্টি সমষ্টির সংঘাতে সমাজ নিরপেক্ষ থাকে না—ফলে সেই বিকাশের চিত্রে সামাজিক শক্তিরও নানা জটিল কাটাকুটি লক্ষ করা যায়; এবং এই বিকাশের হার-ও সর্বদা সমান নয়, ফলে

ঔপন্যাসিককে গতির উপর নজর দিতে হয়। তাই উপন্যা
বিষয় হয়ে ওঠে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজ—সমাজে
(dynamic) রূপান্তর।

তারাশঙ্কর উপন্যাসের সেই যথার্থ বিষয় ধরেন স্বকীয়
পরিপ্রেক্ষিতে, হয়ত অচেতনেই। অচেতনে কেন তা পরে
করা যাবে। আপাতত এইটুকু বলা যথেষ্ট যে তিনি বি
সংকল্পের একাগ্রতার ও একান্ত প্রযত্ন ছাড়াই ঔপন্যাসিক f
করেন অভিজ্ঞতার আবেগে, প্রায় স্বভাব-কবিত্বের মতে
উপন্যাসের যথার্থ বিষয় পাওয়া কম কথা নয়, আর তা
প্রতিভা যে ঐ বিষয়ে স্বচ্ছন্দবিহারী তাঁর গল্পের বিস্তার
বিন্যাস এবং সূচনা-পর্বের কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাসের
মধ্যে তা লক্ষণীয়।

'ধাত্রী দেবতা' তাঁর সেই প্রথম প্রধান বই, যেখা
সমাজের সচলতাকে ধরতে চেয়েছেন অনেক
গ্রামসমাজে ভূস্বামীদের গৌরবজনক ভূমিকার কথা
সমালোচক আমাদের স্মরণ করালেও এবং জমিদার শ্রেণী
ক্ষমতার অধিকারী তথা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হ'লেও এঁরা সমাজে
স্বরূপ ছিলেন, তা প্রাথমিকভাবে যথার্থ মনে হয়। কিং
ক্ষমতার উৎস ও ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি যে জনগণ
বাহুল্য। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষা আমাদের তথাকথিত অ-
ঘৃণা করতেই শিখিয়েছে। ফলে স্বাভাবিক কারণে গ্রা
আলেখ্যে অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী এ যাবৎ লক্ষণীয়ভা
পেয়েছে। আর জমিদারদের খামখেয়াল, অত্যাচার,
—সময় সময় বিশেষ ক'রে দোল-দুর্গোৎসবে দান-খয়রা
একই সঙ্গে চিত্রিত ক'রে তথাকথিত রবিন হুড মোহন মার্ক

স্বৈরাচারীর কাহিনীতে পাঠকও মুগ্ধ হয়েছেন বাস্তবতার সাক্ষাৎ পেয়ে। সাধারণ পাঠকের মনে গ্রাম ও জমিদারের ঐ অনুষঙ্গ এবং জমিদাররা প্রজাদের সুখেদুঃখে সুখীদুঃখী ছিলেন ইত্যাদি অনেক সূক্ষ্ম প্রচারের ফল কিনা তা সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় হলেও বাংলা উপন্যাস পাঠ করলে সেই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

তারাশঙ্কর সেই পথ অনুসরণ করলেও জমিদারতন্ত্র যে মুমূর্ষু এবং পল্লী সমাজে চাঞ্চল্য জেগেছে বাইরের আঘাতে তা বুঝতে পেরেছিলেন। যদিও 'রায়বাড়ি' 'জলসাঘর' প্রভৃতি গল্পে মুমূর্ষু জমিদারতন্ত্রের আলেখ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেদিক থেকে 'ধাত্রী দেবতা' উপন্যাস অনেক ব্যতিক্রম। অন্তত এই প্রথম যথাসম্ভব ভাবালুতা বর্জন ক'রে একজন জমিদারকে নায়ক করা হয়, যে-নায়ক রূপকথা উপকথায় বর্ণিত দোর্দণ্ড বীর অথবা ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন নয়। রাবণেশ্বর রায়, বিশ্বম্ভর রায়ের তুলনায় শিবনাথকে সেজন্য অতি ম্লান প্রায় 'প্লিবিআন' মনে হয়। শিবনাথকে নিতান্ত সাধারণ ক'রে আঁকার অর্থই হল জমিদারতন্ত্রের স্বর্ণযুগ তো বটেই এমন কি তার অবশিষ্ট গৌরবও প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে তা মনে রাখা। এর কারণ অবশ্য এই যে 'বীরভূমের জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হলো জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাদের সংখ্যা বাহুল্য।' (আমার কালের কথা, পৃ ৬)।

অথচ ক্ষুদে জমিদারদের প্রবল প্রতাপের কথা তারাশঙ্করের জানা থাকলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জেনেছিলেন 'লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক' ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাদের অনিবার্য বিরোধের কথা, যে বিরোধে জমিদাররা পিছু হটতে বাধ্য। জমিদার ও ব্যবসায়ীর এই দ্বন্দ্ব নানা পর্যায়ে নানা স্তরে আবদ্ধ থাকলেও তার সংঘাতে সচল হ'য়ে উঠেছে গ্রামসমাজ। সেই চাঞ্চল্যে

ঘুচে গেছে গ্রামীণসমাজের কূপমণ্ডূকতা। কারণ বণিক সভ্যতা হাত বাড়াতে থাকলে সেই সভ্যতার ধ্বজাধারীদের শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে বিক্ষোভ জাগে, সেই বিক্ষোভের ঠেলায় গ্রামসমাজ স্থির বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকে না, তাতে হাওয়া লাগে শহরের এবং জানান না দিয়ে গ্রামসমাজের একাকীত্ব ঘুচে যায় সামাজিক গতির সাধারণ নিয়মে।

'ধাত্রী দেবতা' উপন্যাসে গ্রামের সচলতার রূপরেখা স্পষ্টভাবে ফুটে না উঠলেও জমিদার-নন্দনের মর্তে পদার্পণে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে শিবনাথরা আর তাদের পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে পারে না। অবশ্য শিবনাথের চরিত্রে লেখকের আত্মজীবনের প্রক্ষেপ পড়ায় শিবনাথের রূপান্তর-কাহিনী যত গুরুত্ব পায়, সে অনুপাতে পল্লীসমাজ তত গুরুত্ব পায় না। অর্থাৎ পল্লীসমাজের বিভিন্ন বিরোধী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় শিবনাথের রূপান্তর-কাহিনী বর্ণিত হয় না। তাই উপন্যাসটির বিষয়ে যে বৃহৎ উপন্যাসের সম্ভাবনা ছিল তা লেখকের কাহিনী-বৃত্ত সম্পূর্ণ করার দিকে মনোযোগ থাকায় যথার্থ বিকশিত হয় না। অথচ তারাশঙ্কর স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে শিবনাথ তার আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারে একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশ নিলে। কিন্তু সে পথপরিক্রমার কাহিনী জটিল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ একজন সামন্ততান্ত্রিক জমিদার কি ক'রে তার শ্রেণীচ্যুত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দিতে পারে এবং সেই ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতায় কোন কোন সামাজিক শক্তি অনুকূলে বা প্রতিকূলে থাকে, তার ধারণা না থাকলে উপন্যাস একরৈখিক হয়ে ওঠে। 'ধাত্রী দেবতা' নিশ্চিতভাবে সেই ধারণার অভাবে সরল কাহিনী হয়ে উঠেছে, যদিও তারাশঙ্কর উপন্যাসে শিবনাথকে একটি নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট সমাজপটে স্থাপিত করেছিলেন।

বরং 'কালিন্দী' উপন্যাসে বিরোধের চিত্র অনেক বেশি স্পষ্ট।

কিন্তু এখানেও লেখক সমস্যাটিকে অত্যন্ত সরলভাবে দেখেন ব'লে প্রথমে দুই জমিদারের বিরোধ, অতঃপর মহিনের গুলি ক'রে মারার পর দুই পরিবারের মিলন, অবশেষে জমিদারের সঙ্গে ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির বিরোধে জমিদারের পরাজয় নিছক কাহিনীর পর্যায়ে থেকে যায়। না হ'লে শিল্পপতির সঙ্গে জমিদারের পরাজয় শুধু আইনের ফ্যাকড়ায় ঘটে না। এমন কি অহীন যে সন্ত্রাসবাদী হয় সেই অহীনের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটার কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

'কালিন্দী'তে জমিদার-ব্যবসায়ীর বিরোধ উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ঘটনারূপে আনা হ'লেও যে শক্তিগুলি এই বিরোধ অনিবার্য ক'রে তোলে লেখক সে সম্বন্ধে নীরব থাকেন, অথবা তা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করেন না। সাঁওতালদের উচ্ছেদের যে বিষাদাত্মক চিত্র লেখক উপস্থিত করেন তাতে সেই বিষাদের জন্য সম্পূর্ণ দায় বর্তায় শিল্পপতিদের উপর। অথচ জমিদাররাও এমন অনাবাদী জমি বিশেষ ক'রে অরণ্য কীটপতঙ্গ শ্বাপদসংকুল জমি পরিষ্কার ও আবাদযোগ্য করার কাজে সাঁওতাল বা আদিবাসীদের নিয়োগ করেন কোনো রকম কর ধার্য না ক'রে, কিন্তু জমি আবাদযোগ্য হ'লেই তাদের উচ্ছেদ করা হয় নিশ্চিতভাবে। তারাশঙ্করের একথা অজানা নয়। তবু তিনি উচ্ছেদের সমস্যাটিকে একতরফাভাবে দেখেন ব'লে অথবা সেই উচ্ছেদের ব্যাপারে আদিবাসীদের প্রতিরোধের ব্যাপার আমল দেন না ব'লে সমস্ত ঘটনা করুণাত্মক হয়ে ওঠে, এবং সস্তা সহানুভূতি জাগিয়ে আসল সমস্যার স্বরূপ অথবা সমস্যাটিকেই সঠিকভাবে তুলে না ধরার জন্য 'কালিন্দী' উপন্যাসের মধ্যে সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও তা' রামেশ্বর চক্রবর্তীর ভাবালুতার কাহিনীতে পর্যবসিত হয়।

উপরিউক্ত দুটি উপন্যাস অবশ্য তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তি

'গণদেবতা,' 'পঞ্চগ্রাম' এবং 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-র ভূমিকাস্বরূপ রচিত। যেন ঐ দুটি উপন্যাসে তিনি উপন্যাসের যথার্থ বিষয় ধরার জন্য অনুশীলনে রত ছিলেন। তার মানে এই নয় যে 'ধাত্রী দেবতা' ও 'কালিন্দী' না লিখলে তিনি এসব উপন্যাস লিখতে পারতেন না। আসলে তারাশঙ্কর ক্রমে ক্রমে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন, এবং এতদিনে বুঝতে পারেন যে গ্রামীণ সমাজে জমিদার শ্রেণীর একটি সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও কামার, ছুতোর, কৃষক, মোড়ল ইত্যাদি আমাদের কাছে অবহেলিত তথাকথিত বিরাট জনগণের ভূমিকা কম নয়। ফলে এ যাবৎ গৃহীত ঔপন্যাসিক দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। শিবনাথ, ইন্দ্র রায় বা রামেশ্বর চক্রবর্তীরাই গ্রামের সব নয়, তারা যতই মেরুদণ্ডস্বরূপ ব'লে বিবেচিত হোক না কেন। বিশেষত কৃষি জগতে যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠছিল সেই পরিবর্তনের ছবি তুলে ধরার জন্য গোটা সমাজের চলিষ্ণুতা, তার সমস্ত তাৎপর্য বোঝা দরকার। শিবনাথের মা-র উক্তি 'দেশ কি মাটি শিবনাথ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে' যেন তারাশঙ্করের আত্মানুসন্ধানের প্রেরণা জুগিয়েছে দেশ অনুসন্ধানের অর্থবহ পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কারে। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' সেই প্রক্রিয়ার একটি ফসল তা বলা বাহুল্য।

২

'আমার ইচ্ছা ছিল—'চণ্ডীমণ্ডপ' এবং 'পঞ্চগ্রাম' এই দুইখানি উপন্যাসের একত্রিত রূপের নাম দিব গণদেবতা।' ('পঞ্চগ্রাম', ভূমিকা, পৃ /০)। বস্তুত 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' দুটি পৃথক নাম

হ'লেও আসলে তা একই উপন্যাসের দুটি অংশ, যার পূর্ব অংশ 'গণদেবতা', উত্তর অংশ 'পঞ্চগ্রাম'। একমাত্র উভয় উপন্যাসের নায়ক ও কয়েকজন পাত্র-পাত্রী এক ব'লেই উপন্যাস দুটি একটি গ্রন্থ নয়। পল্লীসমাজের যে চিত্র 'গণদেবতা'-য় উপস্থাপিত হয়েছে, সেই রূপটি সম্পূর্ণ হয়েছে 'পঞ্চগ্রাম'-এ। এই উপন্যাসে পরিবর্তনমুখী গ্রামীণ সমাজে প্রাচীন রীতিনীতির বিপর্যয় ও সেই বিপর্যয়ের মূল কারণ যে অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত তার কথাই বিস্তারিত করা হয়েছে সামান্য একটি ঘটনার সূত্রে। ঐ ঘটনায় প্রাচীন গ্রামপঞ্চায়েতের করুণ অক্ষমতার চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ ঐ পঞ্চায়েতই একদিন সমাজের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার শেষ কথা ছিল।

আসলে যে ভিত্তির উপর পঞ্চায়েতের শক্তি ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই ভিত্তিতে আগেই ফাটল ধরেছে। আর তা ধ্বসে পড়ে শিল্পায়নের দ্রুত অগ্রগতিতে। গ্রামের চেহারা শম্বুক গতিতে পাল্টালেও গ্রাম প্রধানরা কিন্তু সেই একই বিন্দুতে স্থির হয়ে রইলেন, এবং তাঁদের অবলম্বন হল কালজীর্ণ নিয়মকানুন, যে নিয়ম অবশ্য ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করে সহজে। ফলে সেই পক্ষপাতদুষ্ট গ্রাম-পঞ্চায়েত শ্রীহরির মতো ব্যক্তিকে শাসন করে না তার বৈভবের জন্য। তাই অনিরুদ্ধ স্বাভাবিকভাবে সেই পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে, যেহেতু সে এখন তার খাওয়া-পরার জন্য একমাত্র গ্রামের উপর নির্ভরশীল নয়।

অন্যদিকে যে চণ্ডীমণ্ডপ একদিন গ্রামের যৌথ কর্তৃত্বের কেন্দ্র ছিল, সেই চণ্ডীমণ্ডপ এখন পঞ্চায়েতের নিরপেক্ষতা ও পল্লীসমাজের সংহতির অভাবে এবং আর একভাবে সামাজিক শাসনের দুর্বলতার সুযোগে জমিদারের কাছারিতে পরিণত। চণ্ডীমণ্ডপের এহেন রূপান্তরে অর্থনীতি যে প্রচণ্ড দাপট খাটিয়েছে অতি সূক্ষ্ম অথচ

অমোঘভাবে তা 'গণ-পঞ্চ'-র পাঠকমাত্রই জানেন। আর এ রকম অব্যবস্থার সময়ে সুযোগ বুঝে শ্রীহরির মতো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে সমাজের শীর্ষে। অবশ্য এই শীর্ষে ওঠা তার পক্ষে মসৃণ হয় নি।. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে সে নিজেকেও পাল্টাতে চেয়েছে। লেখক সেই ইতিবৃত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। গ্রামসমাজ যে একবিন্দুতে স্থির হ'য়ে নেই এবং পরিবর্তনের ঢেউ যে চাষী কৃষক থেকে শুরু ক'রে জমিদারের গায়ে পর্যন্ত আছড়ে পড়েছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কাহিনী ও চরিত্রের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে। দ্বারিক চৌধুরী জমিদারী থেকে চ্যুত হ'য়ে প্রায় সাধারণ কৃষকের পর্যায়ে নামলেও তার আত্মগৌরব বা মর্যাদা এতটুকু ম্লান হয় না। অন্যদিকে ছিরুপাল জমিদার শ্রীহরি ঘোষ হয়ে উঠলেও তখনো পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নন, এবং এই মর্যাদার আসনে উঠতে তার প্রাণান্ত প্রয়াস। আবার কামার অনিরুদ্ধ পল্লীজীবন থেকে বিচ্যুত হয় কলকারখানার অপ্রতিরোধ্য আহ্বানে। একমাত্র ন্যায়রত্নই বোধ হয় তাঁর আদর্শে নিষ্ঠ থাকেন পুত্র-বিচ্ছেদের শোকাবহ ঘটনার পরও। অথচ যার মুখ চেয়ে তিনি সব সহ্য করেন, সেই বিশ্বনাথই তাঁর নিষ্ঠার মূল যুক্তিকে অস্বীকার করে।

'গণদেবতা'-য় গ্রামসমাজ যে বিবর্তনের মুখে বা গ্রামসমাজের বন্ধন ক্রমে ক্রমে আলগা হয়ে পড়েছে, সেই বিপর্যয়ের কাহিনী তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে 'পঞ্চগ্রাম'-এ। উপন্যাসের এই পর্বে নিম্নবর্ণের পরিবর্তন, বিশেষ ক'রে তাদের আর্থিক দুর্গতি যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার আদ্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারাশঙ্কর সম্মিলিত জমিদারদের করবৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষক ঐক্য, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবোধের ভিত্তিতে গ্রামের এযাবৎ সুপ্ত শক্তির অকস্মাৎ জাগরণের ইচ্ছা যে বিপুল চাঞ্চল্যের জোয়ার আনে—সেই জোয়ারে

ধর্মের ভেদ কেমন ক'রে ভেঙে যায়, সেখানেও মানুষ শোষক ও শোষিত এই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় (ইসরাদ ও দৌলত শেখ)—আর সংকটের সময় কে কোনদিকে অংশ নেবে সে সম্বন্ধে কোনো ভুল হয় না ইত্যাদি বিবরণে সমস্যার মর্মস্থান বিদ্ধ করেন সঠিকভাবে। আমাদের সমাজে প্রতিক্রিয়ার শক্তি যে প্রতিরোধের শক্তি থেকে অনেক সক্রিয় ও শক্তিশালী, ধর্মঘট বানচালের সময় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দেবার ব্যাপারে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর এইখানে অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটি বর্ণনা করেন, যে বর্ণনায় নিপীড়িতদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে না। যেমন তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করেন বন্যাপ্রতিরোধে দেবুর নেতৃত্বে তথাকথিত ছোটলোক হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টার চিত্র।

গ্রামসমাজের সনাতন মূল্যবোধ যে প্রায় বিলুপ্ত হ'তে চলেছে বা গেছে তা স্পষ্ট হয়েছে ন্যায়রত্নের গ্রাম পরিত্যাগের মধ্যে এবং দ্বারিক চৌধুরীর কুলদেবতা বিক্রয়ের ঘটনায়। কিন্তু অতীত আদর্শের বদলে কোনো স্থায়ী নতুন মূল্যবোধ জাগছে কিনা সে ছবি উপন্যাসে উজ্জ্বল হ'য়ে না উঠলেও দেবুর নেতৃত্বে মানুষের কল্যাণধর্ম যে সংহত হচ্ছে, তারই প্রেরণায় যে দুর্গার মতো স্বৈরিণী রূপান্তরিত হয় সেবাপরায়ণ পরোপকারী রমণীতে, এমন কি কবিসংগীতের চরিত্রও পাল্টাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণ ও গৌরের মতো নবীন মানুষ এগিয়ে আসছে কল্যাণ কর্মে—এ সবই ভবিষ্যৎ গ্রাম কি হয়ে উঠবে তারই স্বপ্নে রঞ্জিত। তারাশঙ্করের সিদ্ধান্তসমূহ আমরা গ্রাহ্য করি বা না করি, তিনি গ্রামসমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নানা সমন্বয়ী বা বিরোধী শক্তি কিভাবে কত গভীরে সমাজকে পরিবর্তিত করছে বা করে তা পরিমাপ করেন বা করতে চান, আর সমস্ত গ্রামসমাজের

এই চলিষ্ণুতা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, পরিবর্তনের ঢেউ যে নানা জায়গায় আছড়ে পড়ছে, বা পরিবর্তনের ঢেউ যে বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত, লেখক সে কথা ভোলেন না—এ জন্য বারবার গ্রামের ঘটনাগুলিকে রাজনীতির সূত্রে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়াসী হন।

এ পর্যন্ত তারাশঙ্করের সজাগ মনস্কতার নিদর্শনে আমরা বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। অন্তত এই উপন্যাস ('গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম') বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির একটি তা বলা চলে চরিত্র ঘটনা পরিপার্শ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সৃষ্ট সমগ্র সমাজের চলিষ্ণুতার সঙ্গে জীবনসামগ্র্য ধরার চেষ্টায়। কিন্তু উপন্যাসের মূল দুর্বলতা লেখকের সনাতনত্বের প্রতি টান ছাড়াও কেন্দ্রীয় চরিত্র নির্বাচনের ব্যাপারেও প্রকট। অবশ্য তারাশঙ্কর নির্দ্বিধায় সেকাল-কে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়েছেন : 'তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটিবিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত।...বারবার বলে গেছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, বংশগত ঐতিহ্য মহিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে, অপূর্ণ কামনাকে পরিপূর্ণ করতে। সে ঐতিহ্য সে মহিমা ব্রাহ্মণের। ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমময় মানুষের।...তাই তো শ্রদ্ধা ছাড়া অবজ্ঞা ঘৃণা করতে পারি না সেকালকে। তাই তো বলতে পারি না, সেকাল ছিল ভ্রান্ত।' (আমার কালের কথা, পৃ ২১৭)।

সে-কালের প্রতি অবিচল আন্তরিক শ্রদ্ধা যা আমাদের কাছে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক, যে রক্ষণশীলতা আবার কিনা এদেশে ঐতিহ্যের সমার্থক, তার জন্যেই তারাশঙ্করের লেখায় পিছুটানের স্পর্শ লেগে যায়। অথচ প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে,

সেই ব্যবস্থার কোনো ভবিষ্যৎ নেই তা তিনি বিলক্ষণ জানেন। এবং জেনেও তিনি প্রাচীন ও নবীনের যুদ্ধে সরাসরি সেই আগামীকে বরণ করতে পারেন না একান্ত কুণ্ঠায়। দেবুর চরিত্রে সেই দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ঝুঁকে যায় হয়ত লেখকের অচেতনেই রক্ষণশীলতার দিকে, আর তাই 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে ন্যায়রত্নের গল্প এত গুরুত্ব পায়।

ন্যায়রত্নের ভূমিকা উপন্যাস থেকে উহ্য রাখলে কোনোই ক্ষতি ছিল না। কারণ প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বে নবীনের জয়ের সম্ভাবনা থাকলেও মাঝে মধ্যে প্রবীণও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, ঐ উপন্যাসে তা বিভিন্ন সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর অল্পে তুষ্ট নন। ন্যায়রত্নের ঘটনাটি দু-ভাবে তারাশঙ্করের রক্ষণশীলতার প্রতি অনুরাগ দেখায়—প্রথমত দেবুর জীবনে ন্যায়রত্নের নিদারুণ প্রভাব বিস্তারে তা স্পষ্ট, দ্বিতীয়ত ন্যায়রত্ন-বিশ্বনাথের দ্বন্দ্বে ন্যায়রত্নের গ্রাম-ত্যাগের মধ্যে যে ট্র্যাজিক মহিমা আরোপিত হয়, সেই মহিমায় বিশ্বনাথের পথ ও মতের কথা নিতান্ত ম্লান হয়ে যায়। দেবু নিশ্চয়ই ঘটনাবর্তে বদলেছে, কিন্তু তার জীবনে সেই পিছুটান, যাকে অনেকে আদর্শবাদ বলবেন, তাকে বহু সময় দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে তোলে। সে নিশ্চিতভাবে আদর্শবাদের উচ্চ শিখর থেকে সাধারণের সমতলে নেমে এসেছে। কিন্তু সেই নেমে আসার সময়ও সঙ্গে নিয়ে আসে প্রাচীন যুগের প্রাচীন নীতিবোধ। এই নীতিবোধ যে একপেশে তা প্রমাণের জন্য বিশ্বনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের ব্যাপারটি উদাহরণরূপে আনা চলে। আবার ধর্মঘটের সময় সে যে জমিদারদের ন্যায্য বৃদ্ধির কথা মেনে নেয়, তার মধ্যেও তখন বাতিল হওয়া নীতিবোধ কাজ করে। কারণ সে অনেকদূর বুঝেও আসল বিষয়টি বোঝে না যে আইনবলে জমিদার কর বৃদ্ধির মালিক, সে-আইনের নীতিগত ভিত্তি কি? আইন-আদালতের নানা কচকচি,

যা কিনা শাসক ও সুবিধাভোগীদের একচেটিয়া ব্যাপার তা বাদ দিয়েও এই কথাটি সত্য হয় যে, কৃষকরাই জমির প্রকৃত মালিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে জমির প্রকৃত মালিক ছিল চাষী, জমিতে রাজা বা জমিদারের কোনো স্বত্ব ছিল না। জমিদারের সম্পর্ক ছিল উৎপন্ন শস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি বহু আলোচনা করেছেন, সেজন্য বিষয়টি বিশদ করা হল না। অন্যদিকে বিশ্বনাথের মৃত্যুর ঘটনাটিও আকস্মিক। লেখক কি ঐ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ন্যায়রত্নের বিরোধিতার ফল কি ভয়ঙ্কর হয়, সেই পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন?

আসলে উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হওয়া উচিত ছিল অনিরুদ্ধর। প্রকৃতপক্ষে অনিরুদ্ধই গ্রাম-পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু লেখক অনিরুদ্ধর অধঃপতনের ক্রমিক ইতিহাস থেকে বোঝাতে চেয়েছেন, ঐতিহ্যমুখী গ্রামসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যে কৃষক বা গ্রামবাসী শ্রমিক হ'য়ে যায়, তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে ভয়াবহ। অনিরুদ্ধ যে গ্রামের বহু লোককে কল-কারখানার কাজের জন্য টানে, তাতে গ্রামের সর্বনাশ আসন্ন জেনেই দেবু প্রথমে সম্মত হয় নি, যদিও সে পরে বুঝেছে ধ্বসে-পড়া গ্রামীণ অর্থনীতি এই লোকগুলিকে বাঁচাতে পারে না। অথচ সে বুঝে সম্মতি দিয়েই চ'লে যায় তীর্থে নিজের ভার লাঘবের আশায়। আবার দেবু যে জননায়ক হয়ে ওঠে, সেই ঘটনার পিছনে দেবুর রাজনৈতিক সচেতনতা কতদূর সক্রিয় ছিল তা বোঝা যায় না। তবু সে জননেতা হ'য়ে ক্রমে জনতার সুখদুঃখের অংশীদার হয়েছে। কিন্তু দেবুকে তারাশঙ্কর সেই প্রশ্নের সম্মুখীন করেন না, যে-প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লে সে বিপন্ন না হয়ে বরং আরও গভীরভাবে নিজের ব্যক্তিগত গণ্ডি অতিক্রম ক'রে প্রকৃত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। দেবু

সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লে নিশ্চিতভাবে বিলু ও খোকার মৃত্যু নিয়ে লেখক অতখানি ভাবালুতায় গা ভাসাতেন না। অন্যদিকে সমস্যাটি যদি এভাবেও তুলে ধরা হতো যে দেবু কৃষক পরিবারের ছেলে হয়েও খানিকটা শিক্ষা পেয়ে সে আর তার আগের জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না বা খুঁজে পেলেও দাঁড়াতে অনিচ্ছুক সেই জায়গায়—তবে তাতেও সমস্যাটা দেবুর দৃষ্টিকোণ থেকে এলে একটা বাস্তব তাৎপর্য অনুভব করা যায়। বাস্তব—কারণ তা ঐতিহাসিকও বটে, যেহেতু ঐ সমস্যা এখনো আমাদের দেশে জ্বলন্ত সমস্যা। বিশেষত পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলের লোক যখন তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার আলোক পায়, তখন সে আপন অগোচরেই যেন ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। এতে ছাত্রের দোষের চেয়ে গোটা ব্যবস্থার ত্রুটির দিকে নজর পড়া উচিত। তারাশঙ্কর অবশ্য দেবুকে সেভাবে পরিচালিত করেন নি। দেবু চরিত্র তিনি যেভাবে নির্মাণ করেন, সেই নির্মিতিতে তার ঐ পরিণতি স্বাভাবিক। আর আমাদের আপত্তি দেবু চরিত্রের নির্মাণ-পদ্ধতিতে। তারাশঙ্কর ঐতিহ্য ও প্রগতি—এই দুই বিকল্পের সামনে বা ঐ প্রশ্ন ওঠার আগেই ঐতিহ্যর (যা সনাতনত্বের অন্য নাম) প্রতি তাঁর আনুগত্য আগাম বাঁধা দিয়ে রাখেন। নইলে অনিরুদ্ধর চরিত্র অবহেলিত হয়ে ন্যায়রত্ন প্রাপ্যের চেয়ে হাজার গুণ মর্যাদা পেতেন না, তা বলা বাহুল্য।

৩

'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'-এর নায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায্য আপত্তির প্রশ্ন আবার ওঠে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' প্রসঙ্গে। উপন্যাসের বিষয়ে নিহিত আছে অতীত ও ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব, প্রাচীন

ও নবীনের সংঘর্ষ। বনওয়ারী কাহার পাড়ার মোড়ল, তার নেতৃত্ব-র বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে করালী আবির্ভূত হয় কাহার পাড়ায়, যে কিনা কাহারদেরই ছেলে অথচ যে কৃষিজীবী নয়, অথবা পাল্কী বহনের কাজ করে না। চন্দনপুর কারখানায় কাজ ক'রে ব'লে বনওয়ারী ভীত হয় এই ভেবে যে কলকারখানার বাতাস এবং ঘ্রাণ চাষের লক্ষ্মী সহ্য করতে পারে না। আসলে বনওয়ারীর নেতৃত্ব যে সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে অটুট ছিল, সেই অটল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা-প্রস্তরটি আলগা হয়ে গেছে। তাই হাত থেকে নেতৃত্ব যাবার বাস্তব ভয় তাকে করালীর সম্পর্কে সচেতন করে, কারণ করালী ধীরে ধীরে গ্রামের ছেলেদের ঐক্যবদ্ধ করে, অথবা অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের ফলে তারা ক্রমে করালীর নতুন জীবনের দিকে আকৃষ্ট হয়। আর করালী যে ধীরে ধীরে তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এই আশঙ্কায় সে করালীকে প্রায় খোশামোদ ক'রে তাকে বাগে রাখতে চায়, 'সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে, এই ছোঁড়া থেকে হয় সর্বনাশ হবে কাহার পাড়ার, নয় চরম মঙ্গল হবে। সর্বনাশের পথে যদি ঝোঁকে তবে কাহার পাড়ার অন্য সবাই থাকবে পেছনে—লাগতে লাগবে তার সঙ্গে। সে পথে করালী গেলে বনওয়ারী তাকে ক্ষমা করবে না। তাই তার ইচ্ছা তাকে কোলগত করে নেয়। তার 'পুত্ত' সন্তান নাই।'

বনওয়ারীর চিন্তার মধ্যে আন্তরিকতা ছাড়াও যে একটা শঙ্কা আছে তা বোঝা যায়, আর তাই সে নিজে উদ্যোগী হয়ে করালীকে বাগে রাখার জন্য পাখির সঙ্গে তার বিয়েতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। করালীকে স্বপথে আনার চেষ্টার মধ্যে বনওয়ারীর পরাজিত মনোভাবের ছবি স্পষ্ট। কারণ সে বোঝে করালী তার বাধ্য থাকলে গ্রামের মঙ্গল, অর্থাৎ তার নেতৃত্ব বহাল থাকে। এবং এর বেশি

তার চাওয়াও বেশি নয়, যেহেতু বনওয়ারীও বুঝতে পারে কাহার পাড়া আর সেই কাহার পাড়া নেই। তাই সে মনিব বদলের ব্যাপারে কিছু চিন্তা ভাবনাও করে। কিন্তু করালীকে হাতে রাখার চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হয় করালীর কালাপাহাড়ী আচরণে। সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে, যেহেতু করালীর আচরণ রক্ষণশীল কাহার সমাজের মুলেই কুঠারাঘাত করে। ঐতিহ্যমুখী রক্ষণশীল সমাজ আপন জীর্ণতায় ধ্বংসের মুখে, বাইরে থেকে করালীর আঘাত সেই ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে মাত্র, এবং বনওয়ারী ও করালীর সংঘর্ষ অনিবার্য হতে বাধ্য, যেহেতু দুজন দু-টি বিষম সভ্যতার মুখপাত্র বিশেষ।

করালী যে রক্ষণশীল দলের নয়, তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল সর্প নিধনের ঘটনায়। অথচ কেন করালী এমন কালাপাহাড়ী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা মেলে না, যদিও তার মা-র কলঙ্ক-কাহিনী বা ঘোষ বাড়িতে তার জুতো খাওয়ার কাহিনী বলা হয়। কিন্তু কিসের আবেগ কিসের তাড়নায় সে বনওয়ারীর নেতৃত্ব অস্বীকার করে বা সমস্ত কাহার পাড়ার ধর্ম-সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করে, সেই মনোভঙ্গির কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। কোঠাবাড়ি তৈরির সময় বনওয়ারীর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে, এবং সে-ই জয়ী হয়। আর তখুনি ধরা পড়ে তার মনোভাব, 'কিন্তু করালী আশ্চর্য—ঘর তৈরী ক'রে ঘরখানার ভিতর মেরামত আর করলে না। করবে কেন? ঘরকরাটা তার জেদ। কাহার পাড়ায় কোঠাঘর তোলা হল। চিরকালের নিয়ম-আচারে লাথি মারা হল, হয়ে গেল কাজ।'

অর্থাৎ তার মনোভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে নার্থক (Negative)। এই নার্থক বৈশিষ্ট্যের জন্য করালীর চরিত্র যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও ন্যায়সংগত হয় না। ফলে করালীর চরিত্র বাস্তব হয়ে ওঠে না।

কারণ চন্দনপুরে রেলে বা কারখানায় কাজ করলে চরিত্রে শুধু নার্থক গুণই বর্তায় না। তাছাড়া শ্রমিকেরা যে অবস্থায় কালাপাহাড় হয়ে ওঠে তা বিশৃঙ্খলার সময় বা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সত্য হলেও শ্রমিক মানেই সবকিছু ভেঙে চুরে ফেলছে —এ ধারণার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। এ রকম অবস্থার কথা ভাবা একটা ব্যর্থ চিন্তারই ফল। আসলে তারাশঙ্কর শিল্পায়ন, শিল্পের অগ্রগতি, বা শ্রমিক-মজুরের বিষয়টি আদৌ ভালো-ভাবে জানতেন না বা জানবার চেষ্টা করেন নি। রোমান্টিক কবিদের অনেকে যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতিতে যথেষ্ট আশঙ্কিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা বিষয়টিকে সরলভাবে দেখেন নি। যন্ত্র মানে সভ্যতার ধ্বংস, শ্রমিক মানে নাস্তিক ইত্যাদি অত্যন্ত অপরিণত ধারণা তারাশঙ্করের মনে গেঁথে গেছে তাঁর রক্ষণশীলতার প্রতি প্রীতির জন্য। অথবা তিনি নিজে যে শ্রেণীর সন্তান ছিলেন, সেই শ্রেণীর অবক্ষয় দ্রুত শিল্পায়নের জন্য ত্বরান্বিত হয় ব'লে তিনি যন্ত্রশিল্পের উপর বীতশ্রদ্ধ। তারাশঙ্করের এ-ধারণা অনেকটা প্রকৃত অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে মেনে নেওয়া সিদ্ধান্ত। কারণ বীরভূমের সাক্ষ্য অন্য কথা বলে।

শ্রীঅশোক মিত্র-সংকলিত ১৯৫১ সালের জনগণনার সাধারণ বিবরণী থেকে জানা যায় যে, শিল্পের দিক থেকে বীরভূমের বিশেষ গুরুত্ব নেই, যদিও রামপুর হাটে রেলের প্রধান অফিস স্থাপিত হয়েছিল। তবে সাঁইথিয়া ও আহমদপুর ব্যবসার কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে এবং সেখানে কয়েকটি চালের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বীরভূমের কৃষি উৎপাদনের ক্রমাবনতি সত্ত্বেও জেলার বাইরে লোকে খুবই কমই বেরিয়েছে। হাজার অনটন অভাব সত্ত্বেও তারা নিজেদের ছোট্ট জমি আঁকড়ে পড়ে থাকে। আবার বীরভূমে অন্য

রাজ্য থেকে লোক আসে কম। এর কারণ অবশ্য ভূমির অনুর্বরতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বল্পতা এবং আবাদযোগ্য ভূমির আনুপাতিক অভাব।

তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে বীরভূমের প্রকৃত অবস্থার কথা জানতে হয় এইজন্য যে তিনি নির্দিষ্টভাবে বীরভূমকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পটভূমিরূপে নির্বাচিত করেন। বীরভূমে কিছু কিছু চাল-কল তেল-কলের প্রতিষ্ঠা হলেও ব্যাপক শিল্পায়ন কোনোদিনই হয় নি। ফলে যন্ত্রশিল্পের বিভীষিকা বা কলকারখানার বীভৎস রূপ দেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না সেখানে। আর চাল-কল, তেল-কলকে যন্ত্রশিল্পের প্রতিভূ কেন, ঐ মিলগুলিকে যথার্থ যন্ত্রশিল্পের পর্যায়ে ফেলা চলে কিনা বিবেচ্য।

তাই তারাশঙ্কর যন্ত্রসভ্যতার যে কুফলের বা কুপ্রভাবের কথা বার বার তোলেন, তা কতদূর বাস্তবসম্মত তা জনগণনার বিবরণী থেকে স্পষ্ট হয়। আসলে তাঁর পিছুটান, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ে তাঁর ব্যথা, অন্য কথায় তাঁর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি অহেতুক ভয় পেয়েছে নবীন শক্তির অভ্যুদয়ে। অথচ তিনি সচেতন যে এই নবীন শক্তি, যা ভবিষ্যৎ, তার জয় সুনিশ্চিত। এমন কি বনওয়ারী দৈহিক শক্তিতেই শুধু পরাস্ত নয়, তার স্ত্রীও শেষপর্যন্ত করালীর কাছে আশ্রয় নেয়। সেই চিত্র উপস্থাপিত ক'রে তিনি করালী বা নবীন শক্তিকে জয়যুক্ত করলেও রোগ-জর্জর বনওয়ারীকে সুস্থ ক'রে যখন সেই পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড় করান, তখন অতীতের প্রতি মমত্বই প্রকাশিত হয় নবীন শক্তির জয়কে ম্লান ক'রে, কারণ কাহারেরা নতুন মানুষ হয়েও 'তবু চন্নপুরের পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার থেকেও তাকায় বালিভরা ওই হাঁসুলি বাঁকের দিকে। কিন্তু কি ক'রে ফিরে যাবে তারা, আগে পথ ধরবে কে?'—সেই কথা ভাবে,

এবং ঐ ফিরে যাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে তারাশঙ্করের মূল দুর্বলতা।

৪

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ'-এ তাঁর সম্পর্কে একটি মন্তব্যের অস্পষ্টতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর লেখেন: 'আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয় নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধ হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার স্বপ্ন ছিল। উত্তাল ঊর্মিলতার মধ্যে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ফিরে গিয়ে তটভূমি ভেঙে এবং আবর্ত সৃষ্টি করেই তৃপ্তি পাবার মত মনের গঠন আমার ছিল না।' ('আমার সাহিত্য জীবন', পৃ ৭৯-৮০)।

নিজের সম্পর্কে এহেন উক্তি বলেই নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের শুধুমাত্র উপসংহার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তারাশঙ্কর অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁর অনুভূতি ও আবেগ তুলে ধরেন ঐ মন্তব্যে। 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' এবং 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-র উপসংহার আলোচনা করলে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং ঐ উপসংহারে ধরা পড়ে তারাশঙ্করের আদ্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গি—

১. 'সে স্থির করিয়াছে—আবার সে পাঠশালা করিবে। পাঠশালার ছেলেদের সে লেখাপড়া শিখাইবে, তাহাদের কাছে বেতন লইবে। বিনিময়। সেবা নয়, দান নয়। দেনা-পাওনা। সে তাহাদের লেখাপড়ার মধ্যে তাহার জীবনের আশ্বাসের কথা জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যাইবে।...বুঝাইয়া দিয়া যাইবে—

জানাইয়া দিয়া যাইবে—তোমরা মানুষ, তোমরা মরিবে না, মানুষ মরে না। ···সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য, আরোগ্য, অভয়—এ তোমাদেরও পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি—তাহা শোন—আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহার চেয়ে ছোট নই। কাহাকে বঞ্চনা করিবার আমার অধিকার নাই, আমাকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই।···মানুষের সেই পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই।···

'শুধু তাহাদেরই নয়—পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার; সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, সাহস, অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবে না, আহার্যের শক্তিতে, ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম; নূতন করিয়া গড়িবে ঘর-দুয়ার, পথ ঘাট।···

'দেবু বলিল—সে দিনের প্রভাতে মানুষ ধন্য হবে। পিতৃপুরুষকে স্মরণ করবে উর্ধ্বমুখে সজল চোখে। আমাদের সন্তানেরা আমাদের স্মরণ করবে, তাদের মধ্যেই আমরা পাব—তাদেরই চোখে আমরা দেখবো সেদিনের সূর্যোদয়।···' ('পঞ্চগ্রাম')।

২. 'উপকথার ছোটনদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল। কাহারেরা এখন নতুন মানুষ।···

দিদি তখন কথা শেষ করে বলছে—সব শেষ লো—সব শেষ।

নসু হেসে ঢলে প'ড়ে ব'লে উঠল উচ্চ কণ্ঠে—না লো দিদি, শোন! আমি কি দেখে এলাম শোন্। দেখে এলাম, বাঁশবাঁদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে। আর কি কচি কচি ঘাস! আর দেখে এলাম সেই ডাকা বুকোকে।

—বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে!

—হ্যাঁ।

—আর সেই ডাকাবুকোকে দেখে এলি? করালীকে?

—হ্যাঁ লো পিসী। লুকিয়ে একা গিয়েছে—গাঁইতি হাতে। বালি খুঁড়ছে। বালি খুঁড়ছে। বালি খুঁড়ছে আর কি খুঁজছে। খানিক খুঁজছে, আবার উঠছে, আবার খুঁড়ছে। শুধালাম—কি খুঁজিস? বললে—মাটি। ঘর করব আবার। নতুন কাহার পাড়া হবে। নতুন বাঁধ দেবে।...

'হাঁসুলি বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলি বাঁক।' ('হাঁসুলি বাঁকের উপকথা')।

উদ্ধৃতি দুটিতে ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা 'ইউটোপীয়' নিঃসন্দেহ। প্রত্যেক সৎ ঔপন্যাসিক বাস্তবের নানা কাটাকুটির খেলায় বাস্তবের বহু-স্তরান্বিত অভিজ্ঞতার আলোকে মনন ও প্রজ্ঞার সাহায্যে শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক বাস্তবকে তুলে ধরেন না, তাঁর লেখায় অতীত ও বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যৎ কাঁপতে থাকে আবেগের স্পন্দনে। অথবা বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক আপন কৌশলে সমস্যার স্বরূপ এমনভাবে তুলে ধরেন, যা পাঠকের সামনে সেই সমস্যার সমাধানের রূপরেখাটি অন্তত অথবা সমস্যাটিকে অনিবার্য ক'রে তোলে। তারাশঙ্কর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র বিকাশে সেই সম্ভাবনার চিহ্ন রেখেছেন কিনা তাই বিচার্য।

'আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ' মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে তারাশঙ্করের 'ইউটোপীয়' চিত্র উপন্যাসের ঘটনা-চরিত্রের দ্বন্দ্বসংঘাতে সমুত্থিত, নাকি যে সংগত উপসংহারের দিকে

উপন্যাসের অগ্রগতি, তার চলমান ধারাকে ব্যাহত ক'রে তা লেখকের আরোপিত ব্যাপার ? তাই ন্যায্যত লেখকের সচেতনতার প্রশ্ন ওঠে স্বাভাবিকভাবে। (সচেতন মানে এ ক্ষেত্রে গা ভাসানো নয়, লেখকের সচেতনতা বলতে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝি, যে দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তিনি সমাজ ও ইতিহাসের চলিষ্ণুতাকে বুঝতে পারেন স্বচ্ছভাবে। এবং যে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অন্তত বুঝিয়ে দেবে নানা শক্তির দ্বন্দ্বসংঘাতে সমাজ পরিমাণগত বিষয় থেকে গুণগত পরিবর্তনের দিকে চলেছে, যে পরিবর্তন 'না-এর-না'র ফলে ঘটছে, একটি সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য সমাজব্যবস্থায় যে উত্তরণ হচ্ছে, সেই নতুন সমাজ পূর্বতন সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বৈষয়িক প্রভৃতি সমস্ত মানবিক ক্রিয়াকলাপে উন্নত।) ফলে লেখকের কাছে সেই ঘটনা বা ব্যাপার গুরুত্ব পায়, যা পরবর্তী সময়ে সমাজ ও সমাজ-সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, অথবা যা পরিবর্তনের শক্তিগুলি সম্পর্কে সচেতন করে। তাই সৎ লেখক শুধু বর্তমান নিয়ে মাতেন না, কারণ তিনি জানেন বর্তমান অতীত থেকে উৎসারিত হয়ে ভবিষ্যতে প্রসারিত। তাই পৃথিবীতে অহরহ যে কাণ্ড-কারখানা ঘটছে, সেই কাণ্ডের সবগুলি তাঁর কাছে সমান মূল্যের হয় না। আর এইখানেই পার্থক্য দেখা দেয় যথাযথবাদের (Naturalism) সঙ্গে বাস্তববাদের (Realism)।

সমস্ত ঘটনা তুল্যমূল্য হওয়ার ফলে যথাযথবাদীরা অচিরেই পরিবেশবাদের খপ্পরে পড়েন, যদিও যথাযথবাদীরা অতি আন্তরিকভাবেই বাস্তবকে তুলে ধরতে চান। তাঁরা ঘটনা নির্বাচনে কোনো ভেদাভেদ মানেন না ব'লে মানুষের সৃষ্টিশীল ভূমিকা তাঁদের সহজে গোচরে আসে না। ঠিক ততখানি নির্বাচন তাঁরা সময় সময় সমর্থন করেন, যে-নির্বাচনে সন্নিহিত বর্তমান বিশ্বাসযোগ্য হয়ে

ওঠে। এই নির্বাচনের অভাবে আপাত বাস্তব উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হলেও প্রকৃত বাস্তব ততই দূরে থাকে, কারণ জীবন ও শিল্পের মধ্যে দূরত্ব আছে, সেই দূরত্ব ঘোচানো শিল্প-সাহিত্যে জীবনের প্রতিমূর্তি রচনায় সম্ভব নয়, যেহেতু জীবন হচ্ছে সচল, প্রাণবন্ত এবং কেবলই বিকাশোন্মুখ। পক্ষান্তরে প্রতিমূর্তি হচ্ছে নিশ্চল ও জড়। অথচ এই প্রতিমূর্তি নির্মাণে যথাযথবাদীদের যত তৎপরতা ও উৎসাহ, যদিও তাঁরা বুঝলেনই না যে প্রতিরূপ নির্মাণে শিল্পীর স্বাধীনতা ও কল্পনা প্রতিভা সংকুচিত ও ক্ষুণ্ণ হয় শোচনীয়ভাবে।

অন্যপক্ষে বাস্তববাদীর কাছে সমস্ত ঘটনা তুল্যমূল্য নয় ব'লে তাঁরা যথার্থ নির্বাচনে মানুষের গোটা জীবনই তুলে ধরেন অনন্যতায়। অথচ বাস্তববাদীরা হয়ত জীবনের একটি অতি ক্ষুদ্র খণ্ড নির্বাচিত করেন, কিন্তু সেই খণ্ডাংশে সমগ্র জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়, বোঝা যায় সেই মানুষের সামগ্রিক উপস্থিতি তার সত্তা নিয়ে। যথাযথবাদীরা প্রতিমূর্তি রচনার সময় মাধ্যমের (medium) কথা ভুলে যান ব'লেও তাঁদের ব্যর্থতা হয় চূড়ান্ত। কারণ শব্দ-র পর শব্দ সাজিয়ে অথবা রঙের পর রঙ সাজিয়ে মানুষের জীবনসামগ্র্য তুলে ধরা অসম্ভব। সেদিক থেকে বাস্তববাদী শব্দ বা রঙ প্রভৃতি মাধ্যমের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখেন ব'লে লেখকের সাধ ও সাধ্য, অন্যদিকে তাঁর ইচ্ছা ও উপাদানের দ্বন্দ্ব তাঁকে মূর্খের স্বর্গে নিয়ে যায় না। ফলে যথার্থ নির্বাচনের মাধ্যমে জীবনের খণ্ডাংশে তিনি অনুভব করান জীবনসামগ্র্যের স্পন্দন। (এ প্রসঙ্গে জর্জ লুকাচ-এর অনবদ্য আলোচনা এবং বর্তমান গ্রন্থের বাস্তবতা ও উপন্যাস অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

যথাযথবাদে নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক (?) দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে

বাস্তবকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি রচনা সর্বৈব হয় ব'লে মানুষ ও পরিবেশের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক উপেক্ষিত হওয়ার সমান্তরালে লেখকের সামনে সমগ্র জগৎচিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই সেইসব উপন্যাসে চরিত্র একই সঙ্গে ব্যক্তি ও প্রতিভূস্থানীয় হয় না। মানুষ ও পরিবেশের দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত থাকে ব'লে চরিত্রগুলি অন্তর্দ্বন্দ্ব-বর্জিত একরঙা 'টাইপ'-এর দিকে ঝুঁকে যায়, যে চরিত্র আবার অন্যভাবে সরলতার নিদর্শন হয় মাত্র।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে উপসংহার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যথাযথবাদ ও বাস্তববাদের প্রশ্ন ওঠে এই জন্য যে, উপসংহারে বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যতের যে-চিত্র দেবার চেষ্টা তাঁর উপন্যাসে আছে, সেই আলোকে দেখলে তারাশঙ্করের নির্মাণ-পদ্ধতিকে বাস্তববাদের কাছাকাছি ব'লে মনে হয়। যথাযথবাদীরা বর্তমান নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁরা ঘটনা নির্বাচনে অবিচ্ছিন্নতাকে আমলে আনেন না, অবিচ্ছিন্নতার অর্থ এখানে এই যে বর্তমানের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যতের ওতপ্রোত সম্পর্ক।

তারাশঙ্কর বাস্তববাদীর মতো ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ তোলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গ উত্থাপনে তাঁর বাস্তবজ্ঞান বা বোধ কতদূর সক্রিয় তা সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। বাস্তববাদীকে মার্কসবাদী হতে হবে—এমন দিব্যি কেউ দেয় নি। বরং পৃথিবীর বহু বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক রাজনীতিতে রক্ষণশীল হয়েও জীবনসামগ্র্য দেখার সময় আগামী দিনের নতুন শক্তিগুলিকে চিনতে ভুল করেন নি। তারাশঙ্কর, বলতে দ্বিধা নেই, ব্যক্তিগতভাবে একসময় মার্কসবাদের কাছাকাছি এসেও তাঁর অভিজ্ঞতাকে প্রায় ভাবালুতার স্তরে সীমাবদ্ধ রাখেন। আবেগ মননসমৃদ্ধ হয় না ব'লে তিনি বাস্তববাদের পরিবর্তে যথাযথবাদের সরল পদ্ধতি গ্রহণ করেন অনায়াসে—পিছিয়ে পড়া

গ্রামসমাজের ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষত প্রাচীন সমাজ চিত্রণের সময় সেই রীতি আরো ভয়ঙ্কর হয় ঐ সমাজের প্রতি সহানুভূতি থাকার ফলে। তিনি কিছুতেই প্রাচীন ব্যবস্থা অবক্ষয়ের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন না, অথবা সেই শক্তির ওপর জোর দেন না-যার জন্য সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত হচ্ছে। তিনি যথাযথবাদীদের মতোই জমিদারী ব্যবস্থার বা প্রাচীন গ্রামসমাজের ধ্বংসের চিত্র তুলে ধরেন মূল্যায়ন না করেই। এজন্য তাঁর চরিত্রগুলি অন্তর্দ্বন্দ্ব-বর্জিত এবং আবেগসর্বস্ব হয়। হয়ত তাই শেষপর্যন্ত ভাবালুতাই তাঁর আশ্রয় হয়।

'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে যে রঙের খেলার ছড়াছড়ি, অথবা ঐ উপন্যাসে কেবলি বিশ্বাস্য করার প্রচেষ্টা নানা পুরাণ উপকথার মাধ্যমে, তাতে যথাযথবাদীর পদ্ধতি সহজে লক্ষ করা চলে। পশ্চাদপদ সমাজের চিত্রে অর্থনীতির যে প্রচণ্ড ভূমিকা থাকে, এবং সম্পর্কগুলি আপাত সরল ব'লে মনে হলেও নানা সমস্যায় জটিল—তার চিত্র উহ্য থাকে উপন্যাসে। 'উপকথার ছোট নদী ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে যাবার' তাই ছিল উপযুক্ত রীতি।

অবশ্য তিনি অনেক সময় বাস্তববাদীর মতো পরিবেশ ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হন। কিন্তু পদে পদে লেখকের নীতিবোধ সেই সম্পর্ক সজীব করার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই উপসংহারে তিনি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন, সেই স্বপ্নে সমাজ, জীবন এবং ইতিহাস কোনোটিরই অগ্রগতি পরিস্ফুট হয় না। তা ছাড়া নায়কদের এমন হঠাৎ মতি পরিবর্তনও কাহিনী চরিত্র বা পরিপার্শ্বের কাটাকুটির খেলার ন্যায়ে ঘটে ওঠে না। না হলে 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে দেবুর হঠাৎ সেই বোধ জন্মানোর বাস্তব

ভিত্তি কি—এমন প্রশ্ন তুললে আমরা বিমূঢ় হতে বাধ্য—তেমনি বিমূঢ় হই করালীর কাহার পাড়ায় ফিরে আসা ঘটনায়। এই দুই ক্ষেত্রেই নায়করা প্রত্যাবর্তন করেছে যে স্থান থেকে বের হয়েছিল ঠিক সেইখানে, অথবা আরো পিছনে কোনো এক কাল্পনিক রাজ্যে। 'পঞ্চগ্রাম'-এ যে ছবি পরিস্ফুট তাতে মনে পড়ে কেবল তপোবনের কথা, এক কল্পিত রামরাজ্যের ছবি। যেমন করালীর প্রত্যাবর্তনে মনে হয় সে বুঝি আবার ফিরে আসে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে যা সে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিল। অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর আগামী দিনের সেই নতুন মানুষদের চিনতে অক্ষম হলেন, যাদের চিনেছেন ব্যালজাক বা ডস্টয়েভস্কির মতো শিল্পী তাঁদের মতবাদের বিপক্ষে গিয়ে।

আমাদের আক্ষেপ এই যে, তারাশঙ্কর উপন্যাসের যথার্থ বিষয় হাতে পেয়েও তাকে সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারলেন না। তবু আক্ষেপের মাত্রা কমতো কিছুটা, যদি বুঝতাম তারাশঙ্কর এ জায়গায় এসে থেমে পড়েছেন। কিন্তু 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র পরের ইতিহাস কেবলই তাঁর পশ্চাদাপসরণের কথা। প্রত্যেক সৎ সাহিত্যিকের মতোই তারাশঙ্করেরও প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল শিল্প বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর বিশ্বাস বা মতবাদের। 'পঞ্চগ্রাম'-এর 'ইউটোপীয়'-কে অন্য অর্থও দেয়া চলত, যদি দেখা যেত তাঁর পরবর্তী উপন্যাস আরো বলিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠছে। কিন্তু 'আরোগ্য নিকেতন' থেকে তিনি শুধু তাঁর সাহিত্যিক বিষয় উপলব্ধি করার ক্ষমতা বিসর্জন দিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে তাঁর অতিপরিচিত পরিবেশ ও পটভূমি থেকে সরে এলেন এক কৃত্রিম জগতে—যে জগতের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান তো দূরের কথা, দূর আত্মীয়তাও ছিল না। প্রায় সবটাই গ্রাম্য মন নিয়ে

তিনি শহরকে ধরতে চাইলেন উপন্যাসে, সে শোচনীয় ব্যর্থতার কথা আলোচনা না করাই ভালো। বোধ হয় নিছক অভিজ্ঞতা ও আবেগ একমাত্র সম্বল হ'লে ঔপন্যাসিকের ট্র্যাজিক পরিণতি রোধ করা অসাধ্য, এবং তারাশঙ্করের ব্যর্থতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হয় অনেক কিছু, বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাস রচনার ভূমিকা হিসাবে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যে সমস্যা উপজীব্য, সে সমস্যা এখনও আমাদের কাছে জীবন্ত। গ্রাম ও শহরের মধ্যে যাতায়াত বা অন্যান্য যোগাযোগের নানাবিধ সুযোগ বর্তমানে অবাধ হ'লেও গ্রাম্য ও শহুরে মনের মধ্যে ফারাক আজও যোজন যোজনের; সে ব্যবধান ঘোচার বদলে বরং তিন তিনটে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জবড়জং সমাধানের ভারে দিনের পর দিন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়ায় শহুরে মন শতকরা একশো ভাগ নাগরিক না হয়ে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় বহমান অন্তর্লীন গ্রাম্যতায় অষ্টাবক্র, অন্যদিকে শহরের জাঁক-জমক চটকের প্রভাবে গ্রাম্য মন দূষিত। গ্রাম শহরের অসম বিকাশ, বিশেষত গ্রামকে শোষণ ক'রে শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটার জন্য দেশের ভেতরে আত্মীয়তার সুস্থ অন্তরঙ্গ আবহাওয়া সৃষ্টি করার বহু চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উপরন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে শহুরে উচ্চমন্যতা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে ক্রমে উন্মার্গগামী করার ফলে শহরে পড়াশোনা করার পর গ্রামে যেতে আমার দ্বিধা সংশয় যেন কালাপানি পাড়ি দেবার মতো ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, আবার পাড়াগাঁয়ের ছেলেকেও শহরে পাশ ক'রে গ্রামে ফিরে বা ফেরার মুখে প্রায় শশীর মতো ভাবতে হয়: 'এই সব অশিক্ষিত নরনারী, ডোবা পুকুর, বন জঙ্গল মাঠ, বাকি জীবনটা তাহাকে এইখানেই কাটাইতে হইবে নাকি? ও ভগবান, একটা লাইব্রেরি পর্যন্ত যে এখানে নাই!' এবং এ ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল, নিজের বাসভূমি বিদেশ-বিভূঁই ব'লে মনে হলে তার সংকটের প্রকৃতি আর-পাঁচটা সমস্যার মতো

হেলাফেলার বস্তু নয়, কারণ তখন নিজেকে সুবিন্যস্ত করার প্রচেষ্টায় প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির রক্তাক্ত চেহারা—যে চেহারা একদিকে নিজের সঙ্গে নিজের, অন্যদিকে সমাজসংসারের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। তাই সেই সংকটমোচন নেহাৎ কথার ফানুস উড়িয়ে বা উপদেশের তুবড়ি ছুটিয়ে ক্ষণকালে নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র নায়ক শশী সেই একই সমস্যার আক্রমণে জর্জরিত। সে গ্রামের ছেলে এবং 'গ্রাম্য গৃহস্থের স্বকেন্দ্রীয় সঙ্কীর্ণ জীবনযাপনের মোটামুটি একটা ছবিই ছিল ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তাহার কল্পনার সীমা।' কিন্তু কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে গিয়ে তার সীমিত কল্পনার প্রাচীর সম্পূর্ণ ভেঙে না পড়লেও সেই প্রাচীরে শহর বোধ হয় অনেকগুলি জানলা-দরজা কাটায় সে গ্রামে ফিরে তার পুরনো দাঁড়াবার জায়গায় পা রাখতে বিচলিত, অথচ 'হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য'। তবু গ্রামীণদের অ-মৌলিক স্বাতন্ত্র্যহীন মন, একই কুসংস্কার সুখ-দুঃখে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি লক্ষ ক'রে সে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। পরে অবশ্য অনেকদিন ডাক্তারি করার পর হয়ত একটানা থাকার অভ্যাসে গ্রামজীবনের জটিলতা ও গভীরত্ব আবিষ্কার তার সান্ত্বনাবিশেষ, অথচ সেই আবিষ্কারের আনন্দ শশীর গ্রাম্য-শহুরে মনে গ্রামে থাকার প্রেরণা জোগায় না। শশীর সমস্যা অনেকটা নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার মতো, যদিও সে কাম্যুর বহিরাগতের পূর্বপুরুষ নয়, কারণ শশী কোনো অ্যাবসার্ড-তত্ত্ব উত্থিত চরিত্র নয় অথবা বিরক্তিকর পৌনঃপুনিক অবসাদের শিকার।

২

উপন্যাসের ভিত্তি বাস্তবতা, 'উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক ও প্রসারিত—অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন ও পরিবেশ-সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়।' ('লেখকের কথা', পৃ ৬৬)। তাই শশীর সমস্যা উপন্যস্ত করতে গিয়ে বাস্তবকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরার জন্য শশীর কর্ম ও সংগ্রামের ক্ষেত্র গাওদিয়ার সমাজের বিবরণ দেওয়ার আগে কিংবা সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পথ ঘাট পাড়া প্রভৃতির বর্ণনা অতি সংক্ষেপে হলেও নির্দিষ্ট করা দরকার, কারণ এই বর্ণনার মধ্যে গ্রামের একটা বিশিষ্ট আদল আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তির উপর পরিবেশের প্রভাব নির্ণয়ে উপন্যাসে, বিশেষত আলোচ্য ক্ষেত্রে, ভূ বা নিসর্গ প্রকৃতির চেয়ে সমাজ ও তার মানুষজনের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ, এবং শশীর সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যায় বাধা আসা বা বাধা সরে যাওয়া পাড়াগাঁয়ের জীবনের জটিলতা ও গভীরত্বের তর-তমের উপর নির্ভরশীল। ফলে, শশীর জীবন গ্রাম্য কূপমণ্ডূকতায় কতখানি রাহুগ্রস্ত বা মুক্ত হল তার হিসেবনিকেশে উপন্যাসে বাস্তবতা ধরার শৈল্পিক কলাকৌশল, অন্যকথায় উপস্থাপনার প্রতি নজর দেওয়াও যুক্তিযুক্ত।

গাওদিয়া ছোট্ট গ্রাম, এই গ্রামের সাতঘর বাগদীর বসবাসের কথা উল্লেখ থাকলেও উপন্যাসে তাদের কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। শশীর জীবন নানাভাবে নানাদিকে যাদের কাজেকর্মে প্রভাবিত সেই যাদব, গোপাল, সেনদিদি, যামিনী কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর, অন্তত তারা কৃষক নয়,

তাদের বৃত্তির উল্লেখ নিশ্চয় বাহুল্য এক্ষেত্রে। এমন কি কুসুম-মতির আচার-আচরণ কথাবার্তা মান-অভিমান মধ্যবিত্তসুলভ এবং কিঞ্চিৎ রোমান্টিক। অর্থাৎ গাওদিয়ার মধ্যবিত্ত-অধ্যুষিত জীবনই আলোচ্য উপন্যাসের গ্রামজীবন, যে-জীবন গ্রন্থের পটভূমিকা নিঃসন্দেহে। আর এই পটভূমিকায় উপরিউক্ত এবং আরও অনেক চরিত্র পরিপ্রেক্ষিতের মতো ছোটবড় সচল হ'য়ে শশীকে কখনো অতিষ্ঠ কখনো সহিষ্ণু ক'রে তুলেছে। শশী নিশ্চিতভাবে আদর্শবাদী, অন্তত শহরের মোহ পরিত্যাগ ক'রে গ্রামে ডাক্তারি করার সংকল্পের মধ্যে তার অনুদারতার পরিচয় নেই। বরং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের মনে বৈজ্ঞানিক চেতনার সঞ্চারে তার চেষ্টা কর্মজীবনের শুরুতে প্রায় ব্রতচারীর মতো একনিষ্ঠ, অথচ জগদ্দলপ্রায় অচেতন মনগুলিতে সে-চেষ্টা বারবার প্রতিহত হ'য়ে শশীকে গভীর নিরাশ ক'রে দিয়েছে। যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস বড় হ'লে সেখানে আবহ-মানতাই একচ্ছত্র অধিপতি হয়, ফলে ব্যক্তিগত সংস্কারের চেষ্টা তখন প্রহসন কিনা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' সে-বিষয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তাকে উস্‌কে দেয়।

কিন্তু এ-ধরনের সমস্যায় চরিত্রকে যত বেশি সক্রিয় করা উচিত, শশী তদনুপাতে মোটেই সক্রিয় নয়। তাই একটা বিদ্রোহীর মনোভাবে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য জোরের সঙ্গে কিছু করা তার ধাতে নেই, সে জয়পরাজয়ের ঊর্ধ্বে 'আমি নিমিত্তমাত্র' এ-রকম একটি নিরাসক্ত মনের অধিকারী। সেজন্য এরকম মনের পক্ষে গ্রামে যে-কোনো আলোড়ন তোলা অসম্ভব, এমন কি গ্রামে তার সামান্য খাতিরটুকুও তার ব্যক্তিত্ব-উত্থিত নয়, ডাক্তার হিসাবে যেটুকু সম্মান তার প্রাপ্য, গ্রামের লোক সেটুকুর বেশি দিতে তত উৎসাহী নয়। আসলে শশী আর-পাঁচজন উচ্চ-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের

মতোই রোমান্টিক। শশীর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনের অন্তঃস্থলে যে ভাবালুতার স্রোত বহমান তার পরিচয় ইতস্তত লক্ষণীয়। কলকাতার জীবন কিভাবে এবং কত গভীরে শশীর পরিবর্তনের জন্য দায়ী তার উল্লেখমাত্র উপন্যাসে নেই, কারণ 'একটিমাত্র বন্ধুর প্রভাবে শশী একেবারে বদলাইয়া গেল'। অবশ্য তখন শশীর অনুকরণ করার বয়েস। তবু সেই রকম বন্ধুর আবির্ভাব গ্রামে হ'লে কি শশী তদ্রূপ পরিবর্তিত হতো? কোনো কোনো সময় একটি লোকের প্রভাবে আর একজনের জীবন আমূল পরিবর্তিত হয়, কিন্তু এই পরিবর্তনের পেছনে যে প্রস্তুতি থাকে, সে-প্রস্তুতির বিবরণ জানা জরুরি হয়ে পড়ে। শশীর সমস্যা সঠিক রূপায়ণে অবশ্য শহরজীবনের সামগ্রিক প্রভাবের কথা বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু শহর কলকাতার যে সব বৈশিষ্ট্যের চাপে গ্রাম্য মন বদলানো সম্ভব, সেই বিশিষ্ট প্রসঙ্গ সম্পর্কে মানিকবাবু নীরব। ফলে শহরে বাসের সূত্রে শশীর পরিবর্তন লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী 'সে শুধু ছাপ, দাগ নয়'। তাই গ্রামজীবনে নিজেকে সুবিন্যস্ত করার সমস্যা শশীর ব্যক্তিত্বের গভীরত্ব থেকে উত্থিত নয়, এমন কি গ্রামজীবনের বৈচিত্র্য ও জটিলতা আবিষ্কার করতে সে বোঝে যে তার 'এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহে এ জন্য দায়ী কুসুম। শশীর কল্পনার উৎস সে যেন চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।...শশীর ভাবুকতা উদ্‌ভ্রান্ত হইতে জানে না, কুসুম যেন তাহাকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে—সেই মহা-মানবীকে।'

অর্থাৎ জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে প্রতিবেশের প্রভাব প্রায় শূন্য হওয়ায় সমস্যাটির বিস্তার ও গভীরতা সংকুচিত, এবং অবশেষে তা ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়। আবার শশী গ্রামে বিশেষ বাধা বা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় না, তাবৎ লোকের শশীর

কাজকর্ম সম্পর্কে অনাগ্রহও তাকে নিষ্ক্রিয় করার পক্ষে যথেষ্ট। আবার চরিত্রগুলি একরঙা ব'লেও গ্রাম্য পটভূমিতে শশীর নায়কত্ব পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্তভাবে চরিত্রগুলির উচ্চাবচ স্থাপনের অভাবে সুস্পষ্ট হয় না। শুধু গোপালের চারিত্রিক জটিলতা ও কুসুমের সাহায্যে 'শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সেনদিদির চিকিৎসার ব্যাপারে গোপালের নিষেধের একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা লেখক দিতে চেষ্টা করেছেন। অথচ শশীর প্রতি কুসুমের প্রেমের হেতু কি—এ-বিষয়ে লেখক সম্পূর্ণ নীরব। একমাত্র পরানের নিরেট গ্রাম্যতাই কি কুসুমের শশীর প্রতি আকর্ষণের কারণ, যদিও কারণটি অনুমানের বিষয়মাত্র, যার সমর্থনে উপন্যাস থেকে কোনো পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা বর্তমান সমালোচকের পক্ষে অসাধ্য।

শশী-কুসুমের প্রেমের ভিত্তি সুদৃঢ় ধ'রে নিলেও প্রশ্ন থাকে এদের প্রেমের (যা অবৈধ প্রেম) ব্যাপারে গ্রামের সকলে নীরব কেন? তেমনই অবাধ প্রেমের দৃষ্টান্ত: মতি ও কুমুদের প্রেম। তালবনে কুমুদের আবির্ভাব, সাপে কামড়ানো, মতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও প্রেম ইত্যাদি ঘটনাগুলি অনায়াসে বিনা বাধায় ঘটে, এবং এ ক্ষেত্রেও পল্লীসমাজ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। মতি ও কুমুদের কাণ্ড-কারখানা গ্রামের কারো চোখে পড়ে না, অথবা মতি-কুমুদের বিয়ে নিয়েও পল্লী-মানুষদের মধ্যে কোনো কথা চালাচালি না হওয়া বিশেষ আশ্চর্যের। আর মানিকবাবু এ সময় পল্লী-পটভূমিকার বিশেষত পল্লীসমাজের বিবিধ বিরোধী, সময় সময় পরস্পরবিরোধী, শক্তিগুলিকে কাজে লাগান না দেখে যে কোনো পাঠক বিমূঢ় হতে বাধ্য, কারণ উপন্যাসের প্রাণ ও প্রতিমার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার প্রমাণ 'লেখকের কথা'-র ইতস্তত আত্মবচনগুলি।

যদিও উপন্যাসে বাস্তবের নিয়ম খাটানো স্বৈরতার সামিল, তবু

উপন্যাসে ব্যক্তির জীবন মুখ্য ব'লে উপন্যাসীয় জগৎকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার প্রয়োজন, ফলে উপন্যাসে বাস্তবের নিয়ম বাদ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সেজন্য 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র মতো উপন্যাস আলোচনার সময় অনেক ক্ষেত্রে মানিকবাবুর মন্তব্য 'সাহিত্যের জগৎও মানুষেরই জগৎ, সংসারে সাধারণ নিয়মকানুন সাহিত্যের জগতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে না' (লেখকের কথা, পৃ ৬৩) স্মরণে রেখে সাহিত্যে নিছক বাস্তবের নিয়ম অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ জীবনসামগ্রের যে টানে উপন্যাসের বুনোট নির্মিত, সে-জমিতে নিছক বাস্তব ও শিল্পিত বাস্তবের অবস্থান পাশাপাশি নয়, উভয়ের সম্পর্ক টানাপোড়েনের, প্রায় জড়াজড়ির।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসের সবক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেন নি, এমন কথা বলা মুস্কিল। যাদব ও পাগলদিদির মৃত্যুর রহস্য জেনেও সে কথা ফাঁস ক'রে গ্রামের লোকদের মোহ দূর করা শশীর পক্ষে সম্ভব নয়, অথচ সেই আত্মহত্যাকারী সিদ্ধপুরুষের সঞ্চিত অর্থের অছি হওয়া ও সেই অর্থে নির্মিত হাসপাতালের ভার নেওয়ার মধ্যে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন অতি সূক্ষ্মভাবে যে, যে-পরিবেশকে শশী ঘৃণা করে, এখন সে সেই পরিবেশের পঙ্কে নিমগ্ন। এবং এক্ষেত্রে মানিকবাবুর কৃতিত্ব অসামান্য, কারণ এসময়ে আমরা গ্রামজীবনের জটিলতা ও গভীরত্বের কিছু পরিচয় পেয়ে থাকি। অন্য একটি ক্ষেত্রেও আবার গ্রামের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, বিন্দুর বীভৎস আচরণের পর একচোট হৈচৈ-এর মধ্যে। যদিও এই হট্টগোল যাদবের ইচ্ছামৃত্যু ঘোষণার পর আলোড়নের পর্যায়ের নয়। কিন্তু এ-ধরনের গ্রামসমাজ ও পরিবেশকে ব্যবহার করার উদাহরণ নিতান্ত কম। আর মানিকবাবু বিরাট পটভূমি

ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করেন না ব'লে শেষ পর্যন্ত শশীর সমস্যা ব্যক্তিগত মান-অভিমানের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। শশীর পরিকল্পনা বানচাল ক'রে গোপাল-ই জয়ী হয়। সেনদিদির ছেলেকে কেন্দ্র ক'রে পিতা-পুত্রের সূক্ষ্ম অথচ তীব্র মনোমালিন্যের বিবরণ যে কোনো লেখকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু তার ফলে গোপালের তীর্থ-যাত্রায় শশীর আত্মিক সংকটের এমন সমাধান সুলভ ব'লেই বিবেচ্য, এবং এভাবে গ্রামে থাকার মধ্যে শশী অবস্থার শিকার সেকথা প্রমাণিত করা অবশ্য দুষ্কর নয়। ফলে, গ্রামে এসে শশীর সামঞ্জস্য-স্থাপনের সমস্যাটি নিছক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যেন কুসুমের চলে যাওয়া এবং সেনদিদির ছেলের গোপালের বাড়িতে ঠাঁই নেওয়াই গ্রামে থাকার পক্ষে যথেষ্ট দুর্বিষহ ঘটনা। বিরক্তি হয়ত এমন দু-একটি ঘটনায় অ-সহ্যের স্তরে উপনীত হয়, কিন্তু সেই শীর্ষবিন্দুতে ওঠার কারণসমূহ (বর্তমান গ্রন্থে গ্রামের অসহ চাপের বিষয়) বিশদ করা প্রয়োজন, নচেৎ শশীর সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতায় গ্রাম্য শহুরে মনের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য অবিরাম সংগ্রামের কাহিনী অনুক্ত থাকে। মানিকবাবু এ সম্পর্কে সর্বদা সচতন ছিলেন কিনা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' পড়ে তা বলা মুস্কিল।

উপন্যাসটি শশীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, হঠাৎ মতি-কুমুদের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ উপন্যাসের শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর নিঃসন্দেহে, এবং এখানেই প্রশ্ন জাগে তবে কি লেখকের মনে শশীর সামঞ্জস্যস্থাপনের সমস্যা আদৌ ছিল না? 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র যে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত ব'লে লেখক ঘোষণা করেছেন তা হচ্ছে যাযাবর কুমুদ ও মতির ভবিষ্যৎ নীড় বাঁধার কাহিনী। অতএব কুমুদ, মতি ও জয়ার কাহিনী আলোচ্য উপন্যাসে বিশেষ অংশ রূপে পরিকল্পিত। তাই শশীর সামঞ্জস্য বিধানের কাহিনী উপন্যাসটির একমাত্র অবলম্বন

নয়, এই কাহিনীর অন্তঃস্থলে বা সমান্তরালে অন্য এক বক্তব্য উপস্থাপিত করা বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য ছিল।

পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বর্তমান আলোচনা প্রবন্ধের শুরুতে উত্থাপিত প্রস্তাবের পদে পদে লঙ্ঘনের উদাহরণ। উক্ত প্রস্তাব থেকে এ আলোচনা আরম্ভ করা আদৌ উচিত হয় নি—একথা বলা তাই পাঠকের পক্ষে অন্যায় নয়। উপন্যাসের প্রথম দিকে শশীর সামঞ্জস্যস্থাপনে গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার তুলনামূলক বিবরণ সরাসরি রচিত না হলেও শশীর বিরক্তি ও বারংবার গ্রাম ত্যাগ ক'রে যাওয়ার ইচ্ছায় শশীর মনে শহুরে মানসিকতার ছাপ পাওয়া কঠিন নয়। আর কলকাতা গিয়ে পড়াশোনা না করলে গ্রামের প্রতি তার বিরূপতা এত তীব্র হতো কিনা সন্দেহ। তাই আমাদের আলোচনায় নিতান্ত সংগতভাবে ব্যাপ্তি, বিস্তার ও গভীরতা সমেত সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের জন্য গ্রাম ও শহরের কথা ওঠে। মানিকবাবু এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন ব'লেই স্থান হিসাবে গাওদিয়ার নির্বাচন, শহরে থাকাকালীন শশীর পরিবর্তন, অথবা গ্রামে এসে শহরের উদার জীবনের জন্য হাহাকার ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু লেখক উপন্যাসের কাহিনী চরিত্র প্রভৃতির ক্রমবিকাশে সমস্যার ব্যাপ্তি, বিস্তার ও গভীরতার কথা বিস্মৃত হয়ে আপন অলক্ষ্যেই ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত ক'রে ফেলেন, যেন তা শশীর নিছক ব্যক্তিগত সমস্যা, যে-সমস্যা সমাজ উত্থিত নয় ও তার সঙ্গে সমাজের যোগ সামান্যই। এক্ষেত্রে লেখক অবরোহ পদ্ধতির শিকার হয়ে পড়েছেন, অথচ উপন্যাস রচনার জন্য 'বিজ্ঞান প্রভাবিত মন' অপরিহার্য, এবং একমাত্র বিশুদ্ধ গণিত ব্যতীত বিজ্ঞানের সব গুরুত্বপূর্ণ অনুমান আরোহমূলক।

কিন্তু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় শশীর সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যা

সর্বৈব নয়, কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে সেনদিদিকে কেন্দ্র ক'রে যামিনী কবিরাজ ও গোপালের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ঈর্ষার প্রকাশ, শশীর প্রতি কুসুমের প্রেম ও কুসুমের খেয়ালিপনা, বিন্দুর মদ্যাসক্তি, মতি ও কুসুমের প্রণয় উন্মেষ ও পরবর্তী কাহিনী, অন্তঃশীলা যৌনতার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এমনকি গ্রামে থাকা ও না-থাকা নিয়ে শশীর চিত্তচাঞ্চল্যের মূলে আছে কুসুমের প্রতি ভালোবাসা। সেজন্য সর্বব্যাপী যৌনতার বা জৈবিক বৃত্তির নিদারুণ শক্তির কথা উপরিউক্ত উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে তুচ্ছ করা চলে না। আমরা সবাই অসুস্থ, এবং মানুষ আপন অন্তরালে সবচেয়ে দুর্গম, তার মন জৈবিক কামনা-বাসনার দুর্ভেদ্য অরণ্য—মানিকবাবুর অন্যান্য উপন্যাস মনে রেখে বলা যায় যে, এ-বক্তব্য 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র অন্যতম উপজীব্য সমস্যা নিঃসন্দেহে (কলকাতায় বিন্দুর কাহিনী বা মতি-কুসুম-জয়া উপাখ্যান তার জ্বলন্ত প্রমাণ)।

মানুষের কাজকর্ম আসলে আড়ালে থাকা সেই লিবিডো-র কারসাজি ; আলোচ্য উপন্যাসের মূল সমস্যা সংকুচিত হওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত জৈবিক বৃত্তির অমোঘ শক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাই শশীর আত্মিক সংকট মোচনে সেনদিদির ছেলে এত গুরুত্ব পেয়েছে এবং শশীর সমস্যা অবশেষে পিতা-পুত্রের মান-অভিমানে পর্যবসিত হয়। সর্বব্যাপী যৌনতা সার্থকভাবে উপন্যস্ত করার জন্যও নিছক ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঔপন্যাসিককে তরাতে পারে না, তার জন্যও দরকার সামাজিক পটভূমির। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় অবশ্য লিবিডোর কারসাজির সঙ্গে সঙ্গে অনন্তর উক্তি ('সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।' শশী একটু হাসিয়া বলিল, 'তাকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম।

অনন্ত বলিল, তেমন করে চাইলে পাবেন বইকি, ভক্তের তো দাস তিনি।') যাচাই করার প্রশ্ন ওঠে, কারণ উপন্যাসের নাম ব্যতীত সমগ্র উপন্যাসে আমরা সকলে পুতুল, আমাদের একজন নাচাচ্ছে—এরকম একটা মনোভাব থেকে থেকে উঁকি দেয়। আসলে মানিকবাবু আলোচ্য উপন্যাসে অনেকগুলো সমস্যা এনে ফেলায় মূল সমস্যার সীমা সংকুচিত হয়ে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়। ফলে, শশীর পরিণতি ট্র্যাজিক না হয়ে 'মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না' জাতীয় ভাবালুতায় প্যাথেটিক হয়ে ওঠে, এবং পাঠক হিসাবে আমরা উপন্যাসটির এমন করুণ সমাপ্তিতে ব্যথিত হই।

৩

প্রায় দশবছর পরে লেখা 'শহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসে শহরের পরিচয় অনেক অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ। হয়ত শহর উপন্যাসের পটভূমি ব'লে শাহরিক পরিমণ্ডল ও জীবন খণ্ড খণ্ড ইতস্তত বর্ণনায় এবং সংলাপের মধ্যে ফুটে ওঠে অনায়াসে। শশী গ্রামের ছেলে হলেও উপন্যাসে তার যাত্রা শহর থেকে গ্রামে, এবং সমস্যা সেখানে গ্রামে নিজেকে সুবিন্যস্ত করা নিয়ে। 'শহরবাসের ইতিকথা'-র মোহনের যাত্রা ঠিক তার উজানে, অর্থাৎ গ্রাম থেকে শহরে। এখানে সমস্যা শহরের চলিষ্ণুতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর, বৈষয়িক দিকে উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষ হবার। সেজন্য 'ধীরে সুস্থে সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিবার সময় তার নাই, তাকে অন্য দিকে মন দিতে হইবে। দুশ্চিন্তা না হোক, টাকার চিন্তা করিতে হয় বৈকি। টাকা যে তাকে আনিতে হইবে, সে তা জানে—প্রথম হইতে জানিত।'

কিন্তু গ্রামের বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় বাস করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোহন নিজের কাছে স্পষ্ট নয়, বহুদিন যাবৎ লালিত অসন্তোষ, একটানা গ্রামে বাস করা বা গ্রামজীবনের বিরক্তিকর আবহমানতা বা গ্রামের সংকীর্ণ আবেষ্টনী থেকে মুক্তি পাবার জন্য নিছক নতুনত্বের ঔৎসুক্যেই হয়ত শহরজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, এবং মোহনের বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের পশ্চাতে এমন ঝাপসা কারণের উপস্থিতি অবাস্তব নয়। আমরাও সময় সময় এরকম কারণহীন বা অ-ব্যাখ্যাত কারণের চাপে অনেক কাজ ক'রে থাকি যা আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক। মানিকবাবু মোহনের গ্রামের বাস তুলে দেবার পেছনে এমন কারণ দেখিয়ে মোহনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিঃসন্দেহে। তবে মোহনের শহর বাস নিছক অকারণ নয়, উপন্যাস পাঠে ক্রমে ক্রমে তা পরিষ্কার হয়। বাড়ি, গাড়ি, সঙ্গী ইত্যাদির কামনা তার শহরবাসের অন্যতম কারণ নিশ্চিতভাবে, মোহন এসব অধিকারের জন্য উন্মুখ, তার আচার ব্যবহারে সেই উন্মুখতা প্রকাশিত। সর্বোপরি স্বপরিবারের ভাঙনের মুখে 'টাকা চাই, টাকা। টাকা আনিতে পারিলেই আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে' প্রত্যয়ে বোঝা যায় তার শহরবাসের মূল প্রেরণা কোন্ মূলে প্রোথিত। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব'লে মোহন অর্থের প্রতি লোভকে এমন শোভন ভাবে একটা আবরণের আড়ালে নিয়ে যায়, অথচ শ্রীপতি ও পীতাম্বর তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ না হওয়ায় কলকাতা যাওয়া সম্পর্কে নিজেদের উদ্দেশ্য 'পয়সা কামাবো' গোপন রাখে না, এবং এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট ব'লেই এরা দুজনেই শহরের দ্রুতলয়ের সঙ্গে মোহনের চেয়ে অতিদ্রুত নিজেদের বদলিয়ে নিতে পারে, আর নতুন পরিবেশে 'সামাজিক, পারিবারিক, দৈহিক ও মানসিক জীবন নির্দিষ্ট ভিত্তি' পাওয়ার পর চিরাচরিত রীতিতে

মধ্যবিত্ত যুবকের মতো রোমান্টিক তন্ময়তায় মোহন 'কি যেন গড়িয়া তোলার আয়োজনের মতো শহরের জীবনকে সে কল্পনা করিত' তার অনুসন্ধানে নানা জল্পনা-কল্পনায় কালক্ষেপ করে। অন্যদিকে চিন্ময় ও সন্ধ্যাকে তাক্ লাগাবার অতিসূক্ষ্ম চেষ্টায় শহরের উচ্চবিত্ত-দের আপাতশোভন জীবনযাত্রায় তার সামিল হবার ইচ্ছাই প্রতিফলিত। অবশ্য তার গ্রাম্যতা সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টি দেওয়া, অহেতুক অর্থ-অপচয়ের মধ্যে প্রকাশিত। শহুরে জীবন যে ভয়ঙ্কর কুটিল ও বাড়িগাড়ি হাস্যলাস্যের অন্তরালে শহুরে মন যে সরল নয় চিন্ময়-সন্ধ্যার কাহিনী তার সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ বিবরণ। চিন্ময় ও সন্ধ্যার মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যাপারটি মোহনের মতো সরল মনের কাছে নিশ্চয়ই বিস্ময়ের, অথচ ঐ তুচ্ছ কারণ শহুরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। শহুরে মন সম্পর্কে সে একেবারে অজ্ঞ নয়, লাবণ্যের কাছে লেখা চিঠি তার প্রমাণ। কিন্তু ঐ সচেতনতা দিয়ে শহুরে মনের সবটুকু ধরা যায় না, নইলে শহরে আসার পর ভাই ও মা-র পরিবর্তন তার প্রথমেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখকর জীবনের মোহে পড়ে মোহন ধীরে ধীরে তাদের যৌথ পরিবারের ভাঙনের পথ পরিষ্কার ক'রে দেয় অলক্ষেই, এমনকি সে নিজেও সন্ধ্যার প্রতি অনিশ্চিত আকর্ষণের টানে ধীরে ধীরে বদলেছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের গতি অতি শ্লথ মন্থর, আসলে 'সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, অনিবার্য প্রয়োজন, তার নিজের অন্যধরনের মানুষ হওয়া।' যদিও অন্যধরনের মানুষ হওয়া শুধু কথার কথা নয়, এবং আমাদের গ্রাম শহরের অষ্টাবক্র উন্নতি প্রকৃত গ্রাম্য ও প্রকৃত শহুরে হওয়ার পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই মনের আদল শুদ্ধ শহুরে হলেও সেই আদলের অন্তঃস্থলে গ্রাম্য মন অনেকখানি

জায়গা জুড়ে বসে আছে। জগদানন্দর মতো শহর সম্পর্কে উচ্ছ্বাসক্ত ব্যক্তি তার প্রমাণ। পীতাম্বর যে শেষপর্যন্ত মোহনের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তার মূলেও আছে বি. এস সি. পাশ মেয়ে লাবণ্যর কুসংস্কারে বিশ্বাস।

কিন্তু 'শহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসে এটাই লেখকের মূল বক্তব্য নয়। এ-উপন্যাসেও তিনি একাধিক ব্যক্তব্য (১. শহরে সামঞ্জস্যবিধান; ২. শহুরে মনের জটিলতা, বিশেষত শহুরে মনের বিকৃতি; ৩. শহুরে মনের অন্তরালে গ্রাম্য মনের উপস্থিতি) রাখার ফলে কোনো বক্তব্য লক্ষ ভেদ করে নি। তাই অবশেষে মোহনের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনী পরিচালিত না হয়ে পীতাম্বর, শ্রীপতি, নগেন, ঝর্ণা প্রভৃতির কার্যকলাপ গুরুত্ব পায়। তবে কি নগর-জীবনের একটি সামগ্রিক পরিচয় দিতে লেখক চেষ্টা করেছিলেন? শহরের নানা স্তর থেকে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র তুলে ধরার মধ্যে লেখকের সে ইচ্ছা ছিল, তা নিঃসংকোচে বলা চলে। কিন্তু কোনো চিত্রই সম্পূর্ণ সুবিন্যস্তভাবে পরিবেশিত হয় নি। তাছাড়া নাগরিক জীবনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার জন্য মোহনের গ্রামের বাস তুলে দেবার কাহিনীরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। উপন্যাসটির সম্ভাবনা লেখকের বক্তব্য সম্পর্কে অস্থিরচিত্ততার জন্য সফল হয়ে ওঠে নি।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'শহরবাসের ইতিকথা'-র তুলনামূলক আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, মাত্র উপন্যাসীয় নিরিখেও সে-আলোচনা নিরর্থক, যেহেতু বহু ত্রুটি সত্ত্বেও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' দ্বিতীয় উপন্যাসটির চেয়ে অনেক বেশি সফল ও সার্থক। গ্রাম ও

শহরের মিলিত ছবির মধ্যে দেশের সামগ্রিক রূপ উদ্ভাসিত হওয়া স্বাভাবিক। দুটি উপন্যাসের সমস্যা রূপায়ণে একটি গ্রাম ও শহরকে নির্বাচনের মধ্যে মানিকবাবুর তদ্রূপ ইচ্ছাও ছিল হয়ত, এবং দুটি উপন্যাসের উপস্থাপনা রীতির সাদৃশ্য উক্ত অনুমানের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। শশী ও মোহন উভয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ও উচ্চশিক্ষিত। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের কাহিনী নিয়ে দুই ইতিকথার আখ্যান ভাগ এবং শশী-মোহনের সংস্পর্শে কাহিনীগুলি তাৎপর্য পায়। অবশ্য উভয় গ্রন্থে লেখক শশী কিংবা মোহনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ভঙ্গি পালটেছেন উপন্যাসের প্রায় শেষ অংশে, রীতি বদলানোয় যদিও অনেক মানুষ ও তাদের বিভিন্ন পরিবেশসহ গোটা সমাজকে তুলে ধরার চেষ্টা প্রতিফলিত। এই ইচ্ছা নিশ্চয় প্রসংশনীয়, কারণ বাস্তবকে তুলে ধরার জন্য ব্যক্তির সংগ্রামিক চিত্র বহুস্তরান্বিত বৈচিত্র্যময় হওয়া দরকার।

গোটা নগরজীবন—প্রাসাদ থেকে আস্তাকুড়ের সমাজ ও বাসিন্দা—'শহরবাসের ইতিকথা'-র উপজীব্য। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সমাজের সচলতা মোহনের চরিত্রে কোনো রেখাপাত করে না, পরিবর্তিত করা তো দূরের কথা; তাই বাস্তব ও জীবনের পরস্পর সন্নিহিত বা বিরোধী শক্তির পরিচয়-সমন্বিত জটিল শহরজীবন তার কুটিল ও বিশিষ্ট সমস্যা নিয়ে উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয় না। চিত্রগুলি শহরের বিভিন্ন সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে লেখকের জ্ঞানের উদাহরণ হলেও তা মোহনের অভিজ্ঞতায় সন্ন্যস্ত কিংবা সম্পৃক্ত নয়, সেজন্য মোহনের চরিত্র উপন্যাসীয়-মাত্রা লাভে অক্ষম হয়েছে। দর্শকের মতো মোহন সমগ্র উপন্যাসে একই মানুষ। শশী-ও তেমন দর্শকসদৃশ নিষ্ক্রিয় চরিত্র, এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা'রও অবলম্বন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র ও পরিবারের

কাহিনী। তবু উক্ত উপন্যাসে কাহিনী চরিত্রের বুনোটে পল্লীসমাজের নক্শা সময় সময় স্পষ্ট ফুটে ওঠে বলে শশীর চরিত্র নিছক টাইপ না হয়ে কখনো-কখনো ব্যক্তিত্বে সজীব হয়। কিন্তু সে-সজীবত্ব লেখকের অনবধানতায় (হয়ত মানিকবাবু তখনো রোমান্টিসিজমের মোহ কাটাতে পারেন নি) অচিরে দর্শক চরিত্রের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে, এবং সেই নিষ্ক্রিয়তা কি মধ্যবিত্তজীবনের আশাভঙ্গজনিত বিষণ্ণতারই নামান্তর ?

ভাবালুতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায়, সেজন্য চাওয়া এবং চাওয়ার জন্য পরিশ্রমের আনুপাতিক সম্পর্ক অথবা আকাশকুসুম ভাবার রোমান্টিকতা মিলেমিশে আমাদের বিষণ্ণ ও হতাশ ক'রে তোলে। সেদিক থেকে শশী মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিভূস্থানীয় চরিত্র, যদিও উপন্যাস-শেষে তার চরিত্র গ্রাম্য আবহমানতারই নিকট আত্মীয় হয়ে উঠেছে। একমাত্র তালবনে যাওয়া ছাড়া সে পুতুলের মতোই ডাক্তারি করে, মামলা করে। মধ্যবিত্ত জীবনও অবশ্য বিরক্তিকর, একঘেয়েমিতে বিড়ম্বিত, থোড়বড়িখাড়া জীবনে বৈচিত্র্যের অবকাশ নেই প্রায়, তবু শশীর ও আমাদের ক্লান্তিকর জীবনের বিড়ম্বনার পার্থক্য মৌলিক। আপাত চমৎকারিত্বহীন জীবনের অন্তরালে মধ্যবিত্ত মন বিশেষত ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মন নিদারুণ রহস্যময় ও জটিল, এবং সে-রহস্য ও জটিলতা ভেদ করা যথেষ্ট কঠিন-ও বটে। শশীর মন অন্তত সেই রকম জটিল বা কুটিল নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্তজীবনের জটিলতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনুধাবনে সক্ষম হন নি, তাই 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র মতো উপন্যাসেও গ্রামসমাজের চিত্র উপস্থাপনায় একরঙা চরিত্রের সাহায্য নিয়েছেন। ফলে, উক্ত সমাজের উপরিতলের উদ্ভাসিত চিত্রাবলি তাঁর কাছে বাস্তব ব'লে মনে হয়েছে। এ-উপন্যাসে তিনি যেন যথাযথ

(actual) ও বাস্তবের (real) মধ্যে তফাৎ নির্ণয় করতে পারেন নি। অথচ বাস্তবতার স্বরূপ সম্পর্কে মানিকবাবুর সচেতনতা অনস্বীকার্য, অন্তত ঔপন্যাসিক বাস্তবতা যে উপরিতলের যথাযথ (actual) ব্যাপার নয়, তা তিনি সম্যক জানতেন, সেজন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে ঘাটতি পূরণের জন্য মনের অতলান্তে ডুবুরির মতো নামতে হয়েছিল। সেই অনুসন্ধানে মানুষের মন-গুহাবাসী জৈবিকপ্রবৃত্তির নিদারুণ শক্তি ও সর্বচারিতার অমোঘত্ব সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল। কিন্তু যথাযথের বর্ণনা সর্বব্যাপী যৌনতা সহযোগে সমবায়ে বা সমন্বয়ে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করতে পারে না। জৈবিকতার চেয়ে মৌলিক অন্য কোনো শক্তির সন্ধান তাই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে, সামাজিক সমস্যাবলির উৎস সন্ধানে শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক জীবনের গতিপ্রকৃতি বিচার আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের পরস্পর সম্পর্কগুলি সামাজিক ব'লেই সমাজের হের-ফেরে এগুলি পরিবর্তিত হয়, এবং সমাজের সম্পর্ক পরিবর্তনে অর্থনীতির ভূমিকা যে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে-বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হওয়ায় বর্তমানে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হল। অবশ্য অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৌধের রূপান্তর ঘটা স্বাভাবিক; যদিও এ-বিষয়ে সরলীকরণ যান্ত্রিকতার নামান্তর, কারণ বনিয়াদের উপর অবস্থিত সৌধেরও নিজস্ব নিয়ম আছে এবং সে নিয়মের শক্তিতেই সৌধ-ও সময় সময় বনিয়াদের পরিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত করতে সক্ষম। তাই উপন্যস্ত চরিত্রগুলির পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয়ে সামাজিক বনিয়াদের কথা বিস্মৃত হলে চরিত্র নানা-মাত্রিক সজীব হয়ে ওঠে না। উপন্যস্ত সমস্যা নিছক ব্যক্তিক সমস্যা নয়, তার মূল সমাজে এবং সমাজের বনিয়াদ অর্থনৈতিক জীবন—এই বাস্তবজ্ঞান ও বোধের

সঙ্গে শিল্পান্বিত করার উপযুক্ত ক্ষমতা মিলিত. হলে উপন্যাসের সাফল্য ও সার্থকতা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ পর্বের উপন্যাসগুলিতে বাস্তবের বিস্তার ও গভীরতা ধরার চেষ্টা বিশেষ লক্ষণীয়। এসব উপন্যাসে সমস্যার সামাজিক দিক লেখকের লক্ষ্যস্থল হওয়ায় তিনি যৌনতার অন্ধগলিতেই শুধু ঘুরে ফেরেন নি, যৌন আবেগ ছাড়াও মানুষের আত্মরক্ষার তাগিদ বড় এবং সে তাগিদ তার নিজ অস্তিত্বের। অবশ্য মানিকবাবু সেই বাস্তবজ্ঞান ও বোধকে শিল্পিত করতে অক্ষম হয়েছেন, সেজন্য উপন্যাসগুলিকে বহু সময় খসড়া বা নকশা ব'লে মনে হয়। বরং এসব উপন্যাসের তুলনায় ঔপন্যাসিক জীবনের সূচনান্তরের উপন্যাসগুলি শিল্প হিসাবে অনেক সফল ও সার্থক। অথচ সেইসব উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির আংশিকতাই প্রতিফলিত। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই মহৎ উপন্যাসের, কিন্তু বিষয়বস্তু রূপায়ণের জন্য বাস্তব বোধ ও জ্ঞানের যে প্রসার ও গভীরত্ব আবশ্যিক ছিল, সেই বোধ ও জ্ঞানের অভাবে উপন্যাসটি মহৎ হয়ে ওঠে নি, যদিও বাংলা উপন্যাসের সীমিত পরিসরে এধরনের উপন্যাস লেখা আত্মশ্লাঘার বিষয়।

সীমিত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্য ও সিদ্ধি অনেক বেশি। তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে অনবদ্য কয়েকটি এবং দু-একটি উপন্যাসিকা জাতীয় রচনা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ নিঃসংশয়ে। হয়ত এসব লেখার কয়েকটির বিষয়বস্তু চমকপ্রদও অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে। চমকপ্রদ হলেও সেইসব

রচনা চটকদার বা লোক-ঠকানো সৃষ্টি নয়, বরং, অনাবিষ্কৃত দেশে যাওয়ার শিহরণের চেয়ে ঐসব রচনা আমাদের চেতিয়ে তোলে আরও বেশি। 'চতুষ্কোণ' তেমন একটি গ্রন্থ, যদিও স্বীকার্য কোনো মহৎ উপন্যাসের বীজ উক্ত উপন্যাসে নেই, কিন্তু প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির সুযোগ্য ব্যবহারে এবং বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে 'চতুষ্কোণ' আমাদের সাহিত্যে স্মরণীয় উপন্যাস।

পাথুরে নাগরিক জীবনে সমাজ ক্রমেই সংকুচিত, অট্টালিকা প্রাসাদ প্রভৃতির আক্রমণে মানুষের চলাফেরার অবাধ স্বাধীনতা পদে পদে বিঘ্নিত, ইটকাঠের প্রচণ্ড দাপটে নগরের বুক থেকে প্রকৃতি, আকাশ থেকে চাঁদ-তারা উধাও হয়েছে। আমরা ধীরে ধীরে 'চতুষ্কোণে'র মধ্যে (চার দেয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিসরে) বন্দী হয়ে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করছি—প্রত্যেকেই যেন এক-একটা দ্বীপ, তাই প্রত্যেকে আমরা পরিবেশের চাপে আপন অলক্ষেই বিকৃত অসুস্থ হয়ে পড়ছি, এবং রাজকুমারের মাথাধরার মতো ('কেন ধরে সে নিজেও জানে না।··· তবু মাঝে মাঝে মাথা ধরে।') শহুরে মানুষের যন্ত্রণার যেন নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। নিজেকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে বাইরের খোলামেলা বাতাস বা আকাশ কিছুই ঢুকতে পায় না ব'লে অসুখ হওয়া ও অ-সুখ বোধ করা যে-কোনো লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। এর কারণ অবশ্য অনেক গভীরে নিহিত—সমাজের অসম বিকাশের অতলান্তে, শেষপর্যন্ত অর্থনীতিক বিন্যাসে। আমাদের জীবনে কাজের আনন্দ নেই, শুধুমাত্র জীবিকার জন্য কাজ হলে বিচ্ছিন্নতা ঠেকানো অসম্ভব। আমরা সচরাচর তলিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত নই, রাজকুমার সে রকম তলিয়ে ভাবে নি, কিন্তু সে যে এই সমাজের প্রতিভূ তার চলাফেরা কথাবার্তায় স্বয়ং-প্রকাশিত।

রাজকুমার অনিকেত নয়, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনহীন নির্বান্ধব ব্যক্তি অন্তত মান অভিমান স্নেহ ভালোবাসা জানাবার বা চাওয়ার মতো তেমন কোনো নিকট-আত্মীয়ের পরিচয় উপন্যাসে নেই। মনোরমার সঙ্গে তার সম্পর্ক যদিও বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের নয়, তবু তা কোনোমতেই আত্মীয়তার অন্তরঙ্গ গণ্ডির মধ্যে পড়ে না, সেজন্য আত্মীয় পরিজন পরিবৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার পার্থক্য মৌলিক। 'চতুষ্কোণ'-এর নায়কের আচার আচরণ সেজন্য আমাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে, অথচ জনবিচ্ছিন্ন এই শাহরিক সমাজে কে স্বাভাবিক সে-সম্পর্কে সংশয় জাগা স্বাভাবিক! আমরা আজ নিজেদের অচেতনেই বিকৃতির শিকার। রাজকুমারের পেশা ছাত্রছাত্রী পড়ানো, কিন্তু সাধারণ অর্থে সে প্রকৃত মাস্টার নয়, বরং সে যে ভয়াবহ পরীক্ষায় নিরত তা যে-কোনো শিক্ষকের চাকরি যাওয়ার পক্ষে কেবল যথেষ্ট নয়, ওই অজুহাতে তার অন্য চাকরি পাওয়া অসম্ভব। স্যার কে. এল-এর বাড়ির বর্ণনায় অভিজাত শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতার বর্ণনা ('আরাম উপভোগের আধুনিকতম কত আয়োজন এখানে। এ বাড়িতে যারা বাস করে তারা যেন ধূলোমাটির বাস্তব জগৎকে ত্যাগ করিয়াছে। রক্তমাংসের মানুষের হাসি কান্না ভরা সাধারণ স্বাভাবিক জীবনকে এড়াইয়া চলিতেছে।') কি নাগরিক জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়? তাই রাজকুমারের অকারণ মাথাধরার সঙ্গে সঙ্গে নানা চিন্তা (অসংগত চিন্তা) ভীড় করে। কিন্তু সেই অসংগত ও অন্যায় চিন্তা তার অশ্লীল মনের কাণ্ডকারখানা নয়,— অসৎ উদ্দেশ্যে সে গিরির হৃদ্‌স্পন্দন পরীক্ষার জন্য 'যেখানে গিরির দুর্বল হার্ট স্পন্দিত হইতেছিল' সেখানে হাত রাখে নি—তা গিরির ছি-ছিক্কারে ও গিরির মা-র ধমকের পর তার আশ্চর্য হওয়ার মধ্যে স্পষ্ট।

'কোন জীবনের উপযোগী এ দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন্ পরিচয় আঁকা আছে এই দেহের বাইরে'—সেই তত্ত্ব জানার জন্য রাজকুমারের অস্থিরতা। তাই প্রাণের তাগিদে তত্ত্বটি সঠিক কিনা জানার আকুলতায় সে যে কাজ করে, তাতে তার উদ্ভটত্বই প্রকাশিত। এ-বিষয়ে সে সচেতন, সরসীর সঙ্গে কথোপকথনে তার অসহায় ভাব আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠে: 'ভাবি যে আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কেন। কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সঙ্কীর্ণ জীবন, তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের, ঘৃণা বিচ্ছেদের সম্পর্ক। কারো সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কি যেন বিকার আমার মধ্যে আছে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপছাড়া, উদ্ভট। নাড়ি দেখব বলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেঙ্কারি করি, শুধু খেয়াল বশে রিণি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে সেটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সৌন্দর্যের বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরীর সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল। ...' এর ফলেই 'মানুষ যে কৃপণ তাতে তার কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ মানুষের কাছে সে কিছু চায় না।' নিঃসন্দেহে এ-মনোভাব আধুনিক মানুষের, যে-মানুষ নাগরিক জীবন ও সেই জীবন-উত্থিত অ-সুখের পীড়নে আজ তিক্তবিরক্ত। মহানগরের জীবনে আকাশ নেই মাটি নেই—একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে বাস করার ফলে মানুষের শিরা-উপশিরা সর্বদা টান টান, তার ফলে মনও ক্রমে উত্তেজনায় উত্তেজনায় অবসাদপ্রাপ্ত ও অসাড়। এই অবসাদ ও অসাড় জীবনে নতুন ও বৈচিত্র্য আনার জন্য চাই যৌন উত্তেজনা। কিন্তু

যৌন উত্তেজনাও সহস্র সহস্রভাবে নতুন হলেও তার ক্লেদও মানুষকে এক ঘোরের মধ্যে ফেলে, যে ঘোরে নিজেকেই কুরে কুরে একশেষ করা ছাড়া অন্যপথ নেই, সেই আত্মিক কণ্ডুয়ন-ই নাগরিক জীবনের শেষ আশ্রয়। আধুনিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা আলব্যের কাম্যুর উপন্যাসে অন্যভাবে প্রকাশিত: 'I sometimes think what future historians will say of us. A single sentence will suffice for modern man : he fornicated and read the papers' (*The Fall*)।

কিন্তু মানিকবাবুর রাজকুমার বোধহয় জীবন সম্বন্ধে এত বীতস্পৃহ নয়, তার কাছে কেবল রমণ ও খবরের কাগজ পড়া জীবন নয়। তাই উপন্যাসের শেষে পাগল রিণি-কে বিয়ে করা তার পক্ষে স্বাভাবিক, এবং রাজকুমারের কাছে জীবন যে খেলার জিনিস নেই-সে কথা সরসীর সংলাপে স্পষ্ট হয়। আর এইখানে রাজকুমার আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও কাম্যুর নায়কদের থেকে আলাদা। আধুনিকতার অর্থ অবসাদ-গ্রস্ত হওয়া এবং সেই অবসাদ জীবনবিমুখিনতারই নামান্তর—'চতুষ্কোণ' সে-বক্তব্যের সূক্ষ্ম ও দৃঢ় প্রতিবাদ। তাই রাজকুমারের চরিত্র বুদ্ধি ও মননে সংযত এবং সে বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে সমগ্র ব্যাপারটাকে বুঝতে চেয়েছে, ফলে সৌখিন অবসাদ-তত্ত্বে তাকে সাঁতার কাটতে হয় নি। আবার উপন্যাসের সমস্যা যৌন সমস্যা নয় ব'লে যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা কামকেলির বর্ণনায় লেখক নিজের আয়ুক্ষয় করেন নি। দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নিরূপণে তিনি অবশ্য সামাজিক-পারিবারিক বিস্তৃত পটভূমির আশ্রয় নেন নি, তবু সেই সম্পর্ক সমগ্র জীবনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে—তার বর্ণনাও আমাদের কাছে প্রশংসনীয়। দক্ষ লেখকের হাতে যৌন ব্যাপারও যে উপযুক্ত উপস্থাপনার গুণে

শিল্পোত্তীর্ণ হয় তার প্রমাণ 'চতুষ্কোণ'। এই গ্রন্থে তাঁর অসাধারণ আত্মসংযম ও আশ্চর্য নিরাসক্তি আমাদের দৃষ্টান্তস্থল নিশ্চিতরূপে।

৬

ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লীগ্রামকে উপন্যাসের পটভূমি করেছিলেন। 'শহরতলী' পর্যন্ত রচিত উপন্যাসে শহরের কথা থাকলেও নাগরিক আবেষ্টনী প্রাধান্য পায় নি। অথচ তারপর থেকে পটভূমিরূপে শহরজীবনের ব্যবহারে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, লেখক গ্রাম্য পটভূমিতে কাহিনী রচনাতে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বস্তি অনুভব করেন নি। নচেৎ 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মানদীর মাঝি'র সাফল্যের পর যে কোনো তরুণ উদীয়মান লেখকের পক্ষে সেই মোহ ত্যাগ করা বিস্ময়ের। কিন্তু সেই সাফল্য যে আপাতসাফল্য তা বুঝতে পেরেই তিনি সে পথ পরিত্যাগ করেছিলেন, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রসঙ্গে তার বিষয় কিছু আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত উপন্যাসে গ্রামসমাজ বা পরিবেশ যথেষ্ট এবং উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় নি, নির্বাচিত আখ্যান বা চরিত্রগুলি গতানুগতিক, এবং তা প্রায়ই গ্রামজীবনের উপরিতলের বাস্তবতা। অবশ্য দু-একটি ক্ষেত্রে যৌন জীবনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে ঐ সমাজের অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু সে-পদ্ধতি ঈপ্সিত লক্ষ্য ভেদ করে নি। গ্রামের ছবি নানা জটিলতায় মূর্ত নয় ব'লে শশীর সমস্যা যে সঠিক কি, তা আমাদের ধন্ধ লাগায়। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, অথবা শহর-ফেরা শিক্ষিত গ্রাম্য মধ্যবিত্ত-র মধ্যে কি এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই, যে-বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আমরা

বুঝতে পারব কোন্‌টা কে? মানিকবাবু চরিত্রের সেই বিশিষ্টতা ধরতে অক্ষম হয়েছেন, তাই শশী শহর-ফেরৎ শিক্ষিত গ্রামের যুবক হলেও তার সঙ্গে শহরের আর-পাঁচজন শিক্ষিত যুবকের কোনো তফাৎ নেই। আসলে যে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে মানিকবাবুর জেহাদ সেই রোমান্টিকতা নানা ছদ্মবেশে তাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। নইলে 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতো উপন্যাসও শেষপর্যন্ত কুবের-কপিলার রোমান্টিক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে, অথচ এই উপন্যাসে আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু পদ্মানদীকে পটভূমি ক'রে নিচুতলার মানুষদের সাবয়ব করতে গিয়ে তিনি পটভূমির বিশিষ্ট চেহারা-ছবি ভুলে যা পরিবেশন করেন, সে-সম্বন্ধে অন্য প্রসঙ্গে তাঁরই অভিযোগ যেন ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসে: 'শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসে নি। বস্তিজীবন এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসে নি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসে নি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয় নি, ওই একই রোমান্স দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।' (লেখকের কথা, পৃ ৩০)।

(বাস্তবকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার জন্যই হয়ত মানিকবাবু বৃহত্তর সমাজকে, আমাদের ভাষায় নিচুতলার সমাজ, উপজীব্য করেছিলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। আরম্ভে ইলিশমাছ ধরা, মাছ চালান দেওয়া, বাজারে বিক্রি ইত্যাদির বর্ণনায় সেই ইঙ্গিত পরিস্ফুট। কিন্তু এক্ষেত্রেও সমগ্র ধীবর সমাজের পরিবর্তে একটি অতি ক্ষুদ্র ধীবর

পরিবারই নির্বাচিত হয়, সেই পরিবারে আবার কুবেরই প্রাধান্য পায়।) এর সঙ্গে অবশ্য হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে বসতি স্থাপনের কাহিনী যুক্ত, এজন্য উপন্যাসের পটভূমির বিস্তার ঘটেছে নিঃসন্দেহে, এবং অনেকক্ষেত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' থেকে কাহিনী হয়ে উঠেছে জটিল। উক্ত উপন্যাসের চেয়ে ('পদ্মানদীর মাঝি'র জীবনসংগ্রামের আলেখ্য বেশি উজ্জ্বল। এমনকি এ-উপন্যাসে যৌনজীবনও অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও সুন্দর। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি (পদ্মাপারের ধীবর জীবন) যথেষ্ট কিংবা আদৌ ব্যবহার করা হয় নি ব'লে প্রশ্ন জাগে, উপন্যাসে কোন্ পদ্মানদীকে গ্রহণ করা হয়েছে —উত্তরবঙ্গের, না পূর্ববঙ্গের ? উপভাষা ব্যবহারে লেখক পূর্ববঙ্গের পদ্মাকে বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু সে পদ্মার ভয়াবহ বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে লেখক স্পষ্টত নীরব। এমন কি ভাষা ব্যবহারেও শুদ্ধতা রক্ষিত হয় নি। অন্তত ধীবরদের অন্দরমহলের ভাষায় সেই অঞ্চলের ভাষার নিরেট রূপটি পাওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। অন্যদিকে একটি ধীবর পরিবার নির্বাচিত হলেও সেই পরিবারের কাহিনীর মধ্যে বৃহত্তর জীবনের ছবি আভাসে ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল, যদি মানিকবাবু নদীর সঙ্গে জীবিকার প্রশ্নটি ওতপ্রোত ক'রে তুলতেন) নদীর উপর নির্ভরশীল যাদের জীবন, তাদের সমস্যা নিশ্চিতরূপে জমির উপর নির্ভরশীল কৃষকের চেয়ে আলাদা। কিন্তু উপন্যাস পাঠ ক'রে সেই বিশিষ্ট রূপ ধরা দুঃসাধ্য। দু-একটি ক্ষেত্রে দু-এক লাইনে সে প্রশ্ন উঠলেও কুবের ধীবর না হয়ে কৃষক হলে কোনও ক্ষতি ছিল না ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ (পদ্মানদী ও সেই নদীর উপর নির্ভরশীল জীবনের চিত্র এ-উপন্যাসে অনিবার্য হয়ে ওঠে নি, বরং মাঝি-জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় থেকে অন্য চিত্র-র প্রতি লেখক অচেতনেই হয়ত বেশি মনোযোগী হয়েছেন—যেজন্য মেয়ের

চিকিৎসার ব্যাপারে লেখক বহু শ্রম স্বীকার করলেও উপন্যাসের মূলদেহে তা প্রক্ষিপ্তের মতো থেকে গেছে।

অন্যপক্ষে ময়নাদ্বীপের বসতিস্থাপনের ঘটনা উপন্যাসে সমান গুরুত্ব পায় ব'লে মাঝিদের জীবন-চিত্র উপেক্ষিত হয়। হোসেন মিয়া অনবদ্য চরিত্র, এবং তার খপ্পরে পড়া কুবেরেরও নিয়তি, কারণ অনিশ্চিত জীবনের সমস্যা ও অবশেষে সংকট উত্তরণের জন্য আমাদের অনেককেই হোসেন মিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে কুবেরকে যেজন্য ময়নাদ্বীপে যেতে হয়, সেই কারণটি তার জীবনসংগ্রাম-উত্থিত অনিবার্য কারণ নয়, এবং কুবের যে-ঘটনায় জড়িয়ে যায়, সে-ঘটনা যে কোনো ব্যক্তির জীবনে (কৃষক, মজুর, তথাকথিত ভদ্রলোক) ঘটা সম্ভব। আসলে লেখক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মন নিয়ে ধীবর জীবনের ছবি তুলে ধরেন, এইজন্য এই বিপত্তি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' কোনো মহৎ বা সার্থক উপন্যাস নয়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের মনোভঙ্গি ঔপন্যাসিকের চেয়ে রূপকথা রচয়িতার অধিক আত্মীয়। কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ তিতাসের পারের ধীবর জীবনকে তার নানা আচার আচরণ পুজোআচ্চাব্রতসংস্কার ছড়াগানে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন লেখক। অবশ্য সেই চিত্রে রোমান্টিকতার বা ধীবরের জীবনের প্রতি স্মৃতি-কাতরতার চিহ্ন অত্যন্ত প্রকট। তবু তা আমাদের তিতাসের পারের মাঝিমাল্লাদের স্পষ্ট চিনিয়ে দেয়, এবং তারা যে মাঝি, নদীর উপর তাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'পদ্মা-নদীর মাঝি'তে মাঝিদের জীবনের ছড়াগান ব্রত সংস্কার ইত্যাদি সমেত তাদের বিশিষ্ট জীবনের বিবরণ অনুক্ত থাকে, ফলে কুবেরের জীবনের দুঃখ মাঝির দুঃখ না হয়ে যে কোনো গরীব লোকের যে কোনো অবস্থার দুঃখে পরিণত হয়, এবং উপন্যাসটির প্রচণ্ড দুর্বলতা এইখানেই।

৭

একটি ছোট্ট উপন্যাসে মানিকবাবু নিঃসন্দেহে তাঁর ত্রুটি দুর্বলতার অনেকখানি কাটিয়ে পটভূমির ব্যাপ্তি ও বিস্তার-সমেত সমস্যার গভীরতায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বক্তব্যের মধ্যে মহৎ উপন্যাসের বীজ নিহিত না থাকলেও 'চিন্তামণি' নিশ্চিতভাবে প্রতিভার খেয়ালখুশি নয়, যা অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসের প্রকরণ দেখে মনে হয়। 'চিন্তামণি'তে প্রথম এবং বোধহয় শেষ প্রায় সফলভাবে তিনি একই সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষ ও বৃহত্তর সমাজকে ধরেছিলেন। আসন্ন মহাযুদ্ধ ও আগত মহাযুদ্ধ কিভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের মূল্যবোধ ও সম্পর্ক পালটে দেয় ও জটিল করে 'দিদি'-র চিঠি ও অন্যান্য বর্ণনার মাধ্যমে অতিসূক্ষ্মভাবে প্রায় সময় আভাসে ইঙ্গিতে দেবার চেষ্টা হয়েছে। ফলে পূর্ব-আলোচিত উপন্যাসগুলির মতো 'চিন্তামণি'-র পরিধি সংকুচিত হয় নি, বরং উপযুক্ত বিস্তৃত পটভূমিতে পরিবেশ-সমেত অঙ্কিত হওয়ায় গ্রন্থটি স্বল্পায়তন হলেও উপন্যাসোচিত মহিমা লাভ করে। দু-একটি আঁচড়ে চরিত্রায়নের চেষ্টাও আলোচ্য ক্ষেত্রে সফল হয়েছে এবং সময়-সময় অবক্ষয়িত মূল্যবোধের নির্মমতা ভয়ঙ্কর নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হয়, যেমন—চাঁদের কাহিনী। কোন্ ভিন্‌দেশে সংঘটিত যুদ্ধ আমাদের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তার প্রমাণ মেলে 'তেল নুন মশলার দোকানে আধলা ছিদামের বিক্রি বন্ধ হওয়ার মধ্যে—'। বাজার দর চড়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের লালিত মূল্যবোধের পরিবর্তন আসে। তার ফলে লালসা কামনা অত্যুগ্র হয়ে ওঠে। পণ্যের দাম চড়া ও দেহ পণ্যে পরিণত হওয়া সমান তালে চলে, লেখক তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। আর

'চিন্তামণি'-তে সমাজের সজীব অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় প্রতি ছত্রে। সমাজের পরিবর্তন অর্থনীতির পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল—তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসের মতো প্রচারে সরব না হয়েও এ-উপন্যাসে শিল্পের নিয়মে তা প্রকাশিত হয় ব'লে উপন্যাসটির মূল্য আমাদের কাছে অপরিসীম।

যৌন জীবন ও জীবিকার জন্য সংগ্রামে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির প্রতি ঝোঁক পড়া স্বাভাবিক। তার অর্থ এই নয় যে, জীবিকার তাগিদে আত্মপ্রসারের ইচ্ছা ভোলা সহজ। জীবনকে বিশেষ ফর্মুলায় বাঁধা অসম্ভব, সেজন্য খানিকটা যৌন জীবন, খানিকটা বাঁচার সংরাগের কাহিনী সংযোজনায় জীবনের সজীবত্ব তুলে ধরা যায় না। সজীবত্ব প্রকাশের জন্য যে কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি অনুপযুক্ত। তাই আত্মপ্রসার বা আত্মরক্ষার সমান্তরাল বর্ণনা উপন্যাসের জীবনসামগ্র্য প্রকাশে অক্ষম। উভয়ের রাসায়নিক ঐক্যে তৃতীয় এক নতুন পদ্ধতির সাহায্যে জীবনসামগ্র্য সজীবত্বে প্রকাশ করা সম্ভব। 'চিন্তামণি' উপন্যাসে কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে চিঠির মধ্য দিয়ে লেখক সমাজ ও ব্যক্তির সমস্যা মিলন অবক্ষয়ের বিস্তৃত পটভূমিতে রচেন ব'লে গ্রন্থটিতে বিচ্ছিন্ন চরিত্র ও কাহিনী-সমেত পল্লীজীবন নানা দ্বন্দ্ব-জটিলতায় প্রকাশিত হয়। একদিকে নির্বিত্ত কৃষকের দৈন্য, অন্যদিকে শোষক ব্যবসায়ীর মুনাফা শিকার, আবার আর একভাবে ভিনদেশী বণিকদের অত্যুগ্র লোভ এবং মহাযুদ্ধের ফলে প্রাচীন অর্থনৈতিক বনিয়াদের রূপান্তর—সমস্ত মিলে মিশে চরিত্র-গুলি জটিল হয়ে ওঠে। এ-উপন্যাসে লেখক একরঙা চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকে যথাযথ ব্যবহার করেন ব'লে একরঙা চরিত্রগুলিও নানা বর্ণের সন্নিপাতে ব্যক্তি হয়ে ওঠে, যদিও উপন্যাসে লেখকের অতিসংযম এবং সংক্ষিপ্তি দোষেরই, কারণ সেই সংযম ও সংক্ষিপ্তির

জন্য কাহিনী ও চরিত্র বিস্তারণ অনেকক্ষেত্রে উপন্যাসোচিত হয়ে ওঠে নি, এবং শিল্প হিসাবে সেজন্য উপন্যাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

আমাদের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে সামাজিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপিত, যদিও স্বীকার্য পরিবেশ বর্ণনা নিখুঁত হলেই উপন্যাস সার্থক বা মহৎ হয় না। কারণ পটভূমি, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো অলঙ্করণ নয়। চরিত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠার পক্ষে পরিবেশচিত্রণ অত্যন্ত জরুরি, যেহেতু ব্যক্তি সমাজবিচ্যুত কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়। মানিকবাবু প্রথম থেকেই সে-বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাই ক্রমে ক্রমে তিনি স্বীয় সীমাবদ্ধতা ও গণ্ডি অতিক্রমে এত সচেষ্ট ছিলেন। ঔপন্যাসিক জীবনের সূচনায় তাঁর উপর কল্লোলীয় প্রভাব আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়। বরং সে-প্রভাব পরবর্তী উপন্যাসেও লক্ষণীয়। তবু সেই প্রভাবিত যুগেও 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের প্রচণ্ড রোমান্টিকতার মধ্যে তাঁর স্বকীয়ত্ব উদ্ভাসিত। একমাত্র তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল উপন্যাসের ঐ নিদারুণ উপসংহার রচনা। বস্তুত 'দিবারাত্রির কাব্য'-এ প্রেমের রোমান্টিক ও বিকৃত দিকের সঙ্গে প্রেমের বলিষ্ঠতার কথা যুক্ত ক'রে তিনি কল্লোলীয়দের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েন। এ-উপন্যাসের জগৎ অনেকটা কৃত্রিম, এবং হেরম্বর প্রেম-সম্পর্কিত ধারণা অনেকটা বই-পড়া জ্ঞানের মতো। তবুও 'অনন্ত ত্রিকোণ' প্রেমের কাহিনী শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক মহিমা লাভ করে মানিকবাবুর রচনাগুণে —সর্বোপরি তাঁর বিজ্ঞান-প্রভাবিত মনের জন্য। অথচ এই

সিদ্ধিতে তিনি আত্মহারা না হয়ে প্রেম-কে বৃহৎ পটভূমিতে স্থাপিত ক'রে তার উৎস, কারুকার্য আবিষ্কারে তৎপর হলেন পরবর্তী রচনাগুলিতে, এবং লক্ষ করলেন যে মানুষ আসলে প্রকৃতির হাতে পুতুল মাত্র। তার অদৃষ্ট বোধহয় সর্বব্যাপী যৌনতা ও উদরপূর্তির বৃত্তে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। অথচ এ-সময়েও অর্থনীতির সূক্ষ্ম ও অমোঘ প্রভাবই যে মূল প্রভাব—সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ব'লেই 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল ভিন্নরূপ, অন্তত তিনি বাস্তবকে নানাভাবে ধরায় মনোযোগী ছিলেন, উক্ত উপন্যাসে সিদ্ধি-অসিদ্ধির কথা বাদ দিলেও তা স্বীকার্য। 'আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি' । (লেখকের কথা, পৃ ১৬)। অর্থাৎ মানিকবাবু আপন সিদ্ধির শ্লাঘায় বুঁদ না হয়ে প্রকৃত শিল্পীর মতো নিজের সীমা বারবার ভাঙতে চেষ্টা করেছেন, তার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেন। মার্কসবাদ গ্রহণই এখানে বড় কথা নয়, সত্য আবিষ্কারের জন্য আপাত-সিদ্ধির পথ পরিত্যাগ করা ও সত্যকে জানার আকুলতা ও প্রচেষ্টার কথা এখানে স্মরণযোগ্য। এর ফলে তিনি উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি উভয়ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক পরীক্ষায় নিরত ছিলেন। আর এই পরীক্ষার লক্ষ্যই ছিল বাস্তব জীবনকে পরিবেশ-সমেত তুলে ধরা। উপন্যাসে বস্তুবাদী কল্পনার স্থান গুরুত্বপূর্ণ ব'লেই তাঁকে শেষপর্যন্ত মেহনতি মানুষের কাছে উপনীত করেছিল। 'আমার অসুখ কেন জানিস ? সংসারটা বদখত হয়ে আছে বলে। সংসারটা পাল্টে দেবার লড়াই করব ঠিক করেছি।' 'আরোগ্য' উপন্যাসের নায়ক কেশবের এ-উক্তি আসলে ঔপন্যাসিকেরই দৃঢ়

প্রত্যয়, কিন্তু সেই প্রত্যয় উপন্যাসায়িত করার জন্য যে স্থৈর্য ও সময়ের প্রয়োজন তা মানিকবাবুর আয়ত্তাতীত ছিল। তত্ত্বীয় ভাবে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা সফল হয় নি, অর্থাৎ তাঁর ভাবনাচিন্তা যে সঠিকভাবে উপন্যাসরূপ লাভ করে নি—তার প্রমাণ তাঁর শেষজীবনের উপন্যাসগুলি। কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনের কথা উত্তরকালের উপন্যাসের উপজীব্য হলেও তিনি সেই কৃষক-শ্রমিকদের বাস্তবায়িত করতে অক্ষম হয়েছেন। কারণ যে ভাষা ও ভঙ্গির সাহায্যে এগুলি বাস্তব হয়, তেমন উপকরণ তাঁর আয়ত্তে ছিল কিনা বলা মুস্কিল। বস্তুত সচল সমাজ-বাস্তবতার রূপায়ণের উপযুক্ত রীতি বা পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি। যেজন্য 'আরোগ্য' উপন্যাস শেষপর্যন্ত রোমান্টিক ভাববিলাসেরই উদাহরণ হয়ে পড়েছে। যে যুক্তিবাদী মন হেরম্ব, শশী বা রাজকুমারের মধ্যে সক্রিয় সেই মন যদি কেশবের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে পূর্বেকার চরিত্রের সঙ্গে পরবর্তী চরিত্রের তফাৎ কোথায়—এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। এই অপরিবর্তিত মনোভঙ্গির জন্য মার্কসবাদের সূত্রগুলি তাঁর অতি পরিচিত হয়েও ঈপ্সিত ফল বর্তায় নি ; এমন কি যে ঋজু, প্রত্যক্ষ, সংহত ভাষার জন্য সকলে তাঁর প্রশংসায় মুখর, সেই ভাষা কতদূর উপন্যাসোপযোগী এক্ষেত্রে সে সম্পর্কে সংশয় আসা স্বাভাবিক। তাঁর বুদ্ধিসর্বস্ব চরিত্র ও স্টেটমেণ্ট-সুলভ ভাষা মাটির কাছাকাছি মানুষের মর্মে পৌঁছুবার পথে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক, এ-বিষয়ে দ্বিমত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান প্রধান উপন্যাসের উপরিউক্ত আলোচনায় ঔপন্যাসিকের ব্যর্থতার কথা বেশি জায়গা জুড়ে থাকলেও আমার মতে তিনি বাংলা উপন্যাসের একজন প্রধান পুরুষ। তাঁর সচেতনতা ও সেই সচেতনতা রূপায়ণের চেষ্টায় সাফল্য-

অসাফল্য পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের অবহিত হওয়া শুধু স্বাভাবিকই নয়, আবশ্যকীয়ও বটে। কারণ তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি অধুনা দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত অনেক ঔপন্যাসিকের চেয়ে উপন্যাসের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কৃতবিদ্য তাঁর প্রথম কয়েকটি উপন্যাসেই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। কল্লোল, কালিকলম-দের অধিকাংশ আজীবন সেই কৈশোরক উত্তেজনার মোহ ছিন্ন করতে পারেন নি। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে মশ্‌গুল হয়ে তাঁরা ভিন্‌দেশী চারাকে আমাদের আবহাওয়ায় অভ্য[illegible] না করেই রোপন করেছিলেন। মানিকবাবু অন্তত সে ভুল করেন নি। তিনি আজীবন রোমান্টিক ছিলেন নিঃসন্দেহে, কখনো-সখনো ভাবালু, কিন্তু তাঁর চেষ্টা ছিল বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন নিয়ে সবকিছু দেখা, এবং সেই দেখার ফলকে নানাভাবে নানাদিকে নেড়ে চেড়ে উপন্যাসায়িত করা। কল্লোলীয় স্পর্শ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি যথাযথ বাস্তবের অতলান্তে ঝাঁপ দিয়ে সমস্ত জটিলতা-সমেত প্রকৃত বাস্তবকে অতি-রোমান্টিক উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন। সে-চেষ্টা সর্বদা সফল না হলেও একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, তিনি অনেকের চেয়ে অনেক গভীরভাবে জীবনসামগ্র্যকে তুলে ধরেছিলেন উপন্যাসে। পরবর্তী লেখকদের তাঁর সফলতা-বিফলতার উদাহরণ থেকে পাঠ নেওয়া উচিত, কারণ 'জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনকে জানাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কিভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।' (লেখকের কথা, পৃ ১৫)।

॥ প্রকৃতি আধুনিকতা বিভূতিভূষণের উপন্যাস ॥

আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রধানত বাঙালী মধ্যবিত্তের হরিহর ছত্র; ইংরেজী শিক্ষিত আমাদের লেখায় তাই অনিবার্যভাবে অনুপস্থিত থাকে গ্রাম-বাংলার গ্রাম-জীবনের আলেখ্য, যে আলেখ্য বাদ দিলে থাকে শুধু আধা-গেঁয়ো আধা-শহুরে জীবনের মানসিক কণ্ডূয়নের ক বিচিত্র মানচিত্র। মানসিক কণ্ডূয়ন সম্বল হয় এইজন্য যে শহর-কেন্দ্রিক উপন্যাসেও শাহরিক বাস্তবতা শোচনীয়ভাবে অবর্তমান, শহর আমাদের কাছে বাঁধা পড়ে এক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে, যে গণ্ডি আবার নিজেদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার বৃত্তে সীমাবদ্ধ— যেন কফি-হাউস, রেস-কোর্স, ময়দান, আউটরামঘাট, কার্জন পার্ক, লেক, লিফট, কো-এডুকেশন কলেজ, ড্রইং-রুম, অফিস পাড়ার বড় সায়েবের ঘর ইত্যাদি শহরের প্রতিনিধিস্থানীয় জায়গা, এবং এই সব জায়গায় বিচরণ-শীল নর ও নারী শহুরে মানুষের প্রতিভূ. আর এইসব জায়গাগুলি যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, এবং নর-নারীরা সমাজ সংযোগহীন শৌখিন বিলাসী জীব মাত্র।

সদ্য-প্রস্তুত তালিকা অনন্ত সম্প্রসারিত করলেও শহরের প্রকৃত বাস্তবতা ধরা সম্ভব নয়, কারণ শাহরিক বাস্তবতা ঐ সব চিত্রের সমাহার নয় বা গুণফল, অথচ এই সব জায়গাও তথায় বিচরণ-শীল নর-নারীরা কোনক্রমেই বাদ যায় না শহরের বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার জন্য। শহরের বহু স্তরান্বিত জীবন যে একে অন্যের সঙ্গে অন্বিত, আবার সবগুলি স্তরই বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত এই চেতনার সঙ্গে আমাদের দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা সম্পর্কে বোধ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন, যেহেতু একটি বিশেষ

সময়ে এবং সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে উত্থিত সামাজিক বিবর্তনের একটি পর্যায়ে আধুনিক শহরের উৎপত্তি। আমাদের দেশে সেই সময় ও পর্যায়টি এতই জটিলতায় বিভঙ্গ যে চট্ করে সেই জটিলতার মর্মভেদ সুসাধ্য নয়, তাই এদেশে শাহরিক বাস্তবতা সাহিত্যে তুলে আনা যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার।

আমাদের দেশে আধুনিক শহরের পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বিদেশী শাসকের প্রয়োজনে, সেই বিদেশীদের সঙ্গে নিজেদের বাস্তব অবস্থার প্রভেদ আকাশ-পাতালের তো বটেই, এমন কি তার প্রকৃতি সম্প আলাদা ও মৌলিক। ফলে তেমন শহরে স্বাভাবিকভাবে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্তি লাভ করে না, এবং আমাদের মানসিক গঠনও বিকৃত হয় সেই অনুপাতে যে হারে পল্লী ধ্বংস হয়ে শুধুমাত্র শাসকের প্রয়োজনে নগর গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সেই শহরে পল্লীসমাজ ও নাগরিক সমাজ শুধু পাশাপাশি বাস করে এমন নয়, উভয়ে উভয়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে সুস্থ ও প্রকৃত পল্লী বা নগর কিছুই গড়ে তোলে না, আমাদের শহর হয় কিম্ভুতকিমাকার—গ্রাম ও শহরের এক অদ্ভুত মিশ্রণ, আর তাই আমরা অবশেষে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দেশের জমি থেকে উন্মূল হয়ে না-ঘর না-ঘাটের একটি বিচিত্র জীব হয়ে উঠি।

অন্যদিকে পল্লী সমাজের অবস্থা তথৈবচ, সেখানে সমাজ ধ্বংস যে অনুপাতে হয় সে-অনুপাতে তো দূরস্থান তার শতাংশ গড়ার কাজে ব্যাপৃত হয় নি ব'লে এবং আর একদিকে আধা-শহুরে আধা-গেঁয়ো শহরের বিকৃতি, রূপ ও রুচি তার উপর প্রভাব ফেলায় গ্রামের সামাজিক ও মানসিক জীবন হয়ে ওঠে অষ্টাবক্র ও অসুস্থ। ফলে গ্রাম-সমাজে বিরাজিত শান্তি ও আবহমানতায় পরিবর্তনের হাওয়া লাগলেও নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনে

পল্লীসমাজ বদলানো হয় জন্য পল্লী মানুষ ও পল্লী জীবন যে ন্যায়ে ও হারে উন্নত ও অগ্রসর হয়ে উঠতো তার ব্যত্যয় ঘটে। তাই স্বাভাবিকভাবে সে সমাজও হয়ে ওঠে তেমন জটিল—প্রকৃত সুস্থতার বদলে পঙ্গু ও হীনমন্যতার প্রহারে বিকারগ্রস্ত। তাই পল্লী সমাজের বাস্তবতা ধরাও যথেষ্ট সরল হয় না, বিশেষ করে শিল্প সাহিত্য প্রকৃত বাস্তব থেকে দূরে থাকে ব'লে এবং শিল্প সাহিত্যের নিজস্ব নিয়ম কানুনের জন্য সেখানে মসৃণ ভাবে বাস্তবিকতা তুলে ধরা সম্ভব নয়, কারণ প্রকৃত বাস্তব ও সাহিত্যের বাস্তবের সম্পর্ক [redacted]সাঙ্কের মত সহজ সরল নয়, তা দ্বন্দ্বমূলক ও জটিল।

একদিকে অবশ্য আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়ার বদলে আশ্বস্ত হওয়া উচিত, কারণ বাঙালী ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ শহরবাসী হওয়ায় তাঁরা যতই গণ্ডিবদ্ধ জীবনের আলেখ্য রচনা করুন না কেন তা ভুলে গিয়ে আপন সীমা ছাড়িয়ে গ্রামে দু-দিন ঘুরে এসে গ্রাম নিয়ে উপন্যাস লেখেন না। একথা সকলের জানা যে কেবল আবেগ অনুভূতি সম্বল ক'রে সৎ শিল্প বা সাহিত্য রচিত হয় না, কারণ মানুষের ঐ দু'টি মানসিক ক্রিয়া ভাবালুতায় রূপান্তরিত হয় নিমেষে, একমাত্র সম্ভব বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব চেতনা উত্থিত নিরেট অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতালব্ধ কল্পনা পারে শিল্পী সাহিত্যিক-কে বৈতরণী তরাতে। তার মানে এই নয় যে আবেগ অনুভূতি নির্বিবাদে বাদ দেওয়া চলে, বাদ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তারা উভয়ে অঙ্গীকৃত হয়ে যায় অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ কল্পনায়। বোধ হয় অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ কল্পনার অভাবে অন্য কথায় বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব চেতনার অভাবে এবং মাত্র আবেগ ও অনুকম্পায় নির্ভর করেছিলেন ব'লে শরৎচন্দ্র পল্লী সমাজ নিয়ে উপন্যাস লিখতে গিয়ে বারবার বিড়ম্বিত হন, অবশ্য তিনি 'অতি আধুনিক

উপন্যাস' (শেষ প্রশ্ন প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য) লিখতে গিয়েও সেই একই ভাবে অভিজ্ঞতার অভাবে পর্যদুস্ত, এবং তাতেই বলা চলে—পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা এক জিনিস নয়, যদিও পর্যবেক্ষণ ছাড়া অভিজ্ঞতা সম্ভব নয় প্রায়ই। আর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-র পার্থক্য-ই একজন ঔপন্যাসিককে যথাযথবাদী (naturalist) এবং অন্যজনকে বাস্তববাদী ক'রে তোলে। শরৎচন্দ্রর পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে অনেকের কোনও সংশয় নেই, কিন্তু সেই পর্যবেক্ষণ যে দৃষ্টির বলে অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয় সেই বাস্তব বোধ ও বাস্তব চেতনার অভাব তার মধ্যে ছিল দুর্মর ভাবে বর্তমান, তাই [redacted] সমাজের দলাদলি, হানাহানি, সংকীর্ণতা, চরিত্রের মহানুভবতা ও কুটিলতা, সমাজ বদলানোর শুভ ইচ্ছা ইত্যাদি অবশেষে ভাবাবেগের পর্যায়ে থেকে যায়, অথচ এই সব আলেখ্য থেকে ওঠে আসতে পারতো পল্লী সমাজের সামগ্রিক বাস্তবতা, যে সামগ্র্য তুলে ধরার জন্য দরকার ছিল পর্যবেক্ষণকে সুস্থির এবং সেই দেখা-কে সংকটের সামগ্রিক রূপের সঙ্গে অন্বিত করা। তবু শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের বৃহত্তর জীবন-কে উপেক্ষা করতে পারেন নি, এজন্য তাঁর চেষ্টা হাজার পঙ্গু ও ব্যর্থ হলেও পরবর্তীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে স্বাভাবিক কারণে, হয়ত ঐতিহাসিক ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়াও ফলপ্রদ।

বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এমন তথ্য আমাদের জানা নেই, কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্র-কে পাশ কাটিয়ে শরৎচন্দ্র প্রভাবিত এলাকা এড়িয়ে পল্লী জীবনই উপজীব্য করেন তাঁর প্রথম ও প্রধান উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'তে। শরৎচন্দ্রের হানাহানি, দলাদলিতে দ্বিধাদীর্ণ অস্থির পল্লী সমাজের পাশে 'পথের পাঁচালী'-র জীবন আশ্চর্য শান্ত ও সমাহিত, যেন চিরাচরিত আবহমানতার প্রাচীরে এতটুকু চিড় ধরাতে পারে নি গ্রাম্য দলাদলি'

অতিরিক্ত দারিদ্র্য বা শহরের বিচিত্র প্রভাব। আসলে 'পথের পাঁচালী'-তে যে গ্রাম জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়, তা প্রধানত অপু ও দুর্গার মাধ্যমে বর্ণিত। অপু ও দুর্গা উভয়েই নিতান্ত শিশু বালক বালিকা মাত্র, তাই পল্লী সমাজের সমস্যা ও সংকট ধরার মত চেতনা এখনও তাদের অর্জিত হয় নি, ফলে শরৎচন্দ্র পল্লী সমাজের ভাঙনের দুরবস্থা বা সংকটের চিত্র যতটুকু তুলে ধরেন, ততটুকু কেন তার সামান্যতম অংশও চোখেব আড়ালেই থেকে যায় বিভূতি-ভূষণের উপন্যাসে।

পল্লীসমাজের নিষ্ঠুর নির্মমতা তার সামগ্রিক সমস্যা ও সংকটেব চিত্র আর এক ভাবে বিভূতিভূষণ এডিয়ে যান, সে এড়িয়ে যাওয়া অবশ্য পাঠকের কাছে চট্ করে ধরা পড়ে না—নিশ্চিন্দিপুব গ্রামের সবটা নয় মাত্র একটি পরিবারের কাহিনী তিনি নির্বাচিত করেন, যে পরিবারের কর্তা হরিহর অবশ্য প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে কাহিনীতে অথচ উপন্যাসটি পড়ে গেলে লেখকের এই সীমিত নির্বাচনের বিষয়টি ধরা পড়ে না, এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। পাঠকের চোখে প্রথমে ধরা পড়ে না এই কারণে যে তিনি অপু ও দুর্গার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রচেছেন অতি সূক্ষ্ম ভাবে, একজন, কেবলই কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে উড়ে চলে, অন্যজন তার কল্পনার রথ-কে কেবলি মাটির দিকে নামিয়ে আনে। অপুর দৃষ্টিভঙ্গি এই রকম ঃ

ক) অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময় মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেকদূর, ঘুড়িটা—কুঠির মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারিত না, বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত—**' (নবম পরিচ্ছেদ)

খ) 'সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয় অনেক সময়ই মনে হয়—সেই যে বছর-দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠপাখি দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু-ধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।' (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)।

গ) 'প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এরকম লতাপাতার মধুর গন্ধ ভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন! (ষোড়শ পরিচ্ছেদ)।

ঘ) 'অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে।***অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল।—অপু কখনো জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার যে ব্রত, নিজের অলক্ষিতে মুক্তারূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিল।' (সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ নিশ্চিতভাবে অপুর মানসিক পরিমণ্ডলের একটি মানচিত্র উপস্থিত করে, যে মানচিত্র দেখে যে কোনও পাঠক সহজেই বলতে পারেন যে অপু রোমান্টিক ও প্রকৃতি প্রেমিক, সংসারের প্রতি তার দৃষ্টি মোটেই নিবদ্ধ নয়।

অন্যপক্ষে দুর্গার দৃষ্টিভঙ্গি অপুর সঙ্গে একটি মাত্র সংলাপে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

'শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি দিদি, ছাখ্ ছাখ্ ঐদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে ? ঐ গাছটার পিছনে ? কেমন অনেক দূর, না ?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি ? দূর তুই একটা পাগল।' (ষোড়শ পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ অপু যদি ঘুড়ি হয় তবে দুর্গা তার লাটাই। অপু কেবলি প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়ে যেতে চেয়েছে কখনো সচেতনে কখনো স্বাভাবিকভাবে। তার এই ধরনের মানস পরিমণ্ডল গঠনে প্রকৃতির মোহময় হাতছানি ছাড়া আনুষঙ্গিক কয়েকটি জিনিস তার আবেগ-সমূহকে উদ্দীপ্ত ও তীক্ষ্ণ করে, তার সবগুলি (যেমন—রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনে তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কল্পিত অভিনয়, শকুনের ডিমের সাহায্যে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা, যাত্রাদলের প্রভাব, ঐতিহাসিক উপন্যাস পঠন-পাঠন ইত্যাদি) অপুকে সংসার কর্দমে প্রোথিত করার বদলে আকাশে উড্ডীন করে। অথচ যার সাহায্যে সে সচেতনভাবে প্রকৃতির সাহচর্য ও মাধুর্য লাভ এবং উপভোগ করে সেই দুর্গার প্রকৃতি সম্পর্কে কৌতূহল বোধহয় প্রাথমিক পর্যায়ের ঊর্ধ্বে নয়, সাধারণ ভাবে ফলমূল আহরণ ও সেই ফলমূল খাদ্যরূপে গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ একই প্রকৃতি দু'টি বালক বালিকার

মনে ভিন্ন ভাবে কাজ করে ও প্রতিফলিত হয়, সেজন্যই 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থটি রূপকথা না হয়ে উপন্যাস হয়ে ওঠে, কারণ অপুর আকাশচারিতাকে মাটিতে নামিয়ে না আনলে উপন্যাসের মূল কেন্দ্র মানুষ এবং তার প্রধান উদ্দেশ্য মানব প্রত্যয় বিঘ্নিত হয়, আর দুর্গা বার বার 'পথের পাঁচালী'-কে আকাশবিহারী ও মনোচারী পথ থেকে টেনে এনেছে মর্তের মাটিতে। ফলে লেখক একই সঙ্গে উপন্যাসটির পরিমণ্ডল বাস্তব করে তুলতে এবং গ্রাম-সমাজকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। শুধু মাত্র অপুর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলে হয়ত আমরা শিথিল বাক্য বিন্যাসের মধ্যে এক অপূর্ব কাব্য-মিশ্রিত গদ্যের সন্ধান পেতাম, কিন্তু তা এমনই বায়ুভুক হয়ে উঠতো যে উপন্যাসের কেন্দ্রে তাকে ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য হতো।

অপুর জীবন অনুসরণ করলে বোঝা যায়, বিভূতিভূষণ অপুর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, যেন পেট থেকে পড়েই অপু এক সম্মোহিত বালক যে প্রকৃতির রহস্য ও মোহাঞ্জনে বিহ্বল, হতচকিত এবং অভিভূত, ফলে প্রকৃতির প্রতি সে সচেতন দৃষ্টিক্ষেপ করে কদাচ, তাই তার ব্যক্তিত্ব উন্মেষে প্রকৃতির ভূমিকা শূন্য বললেই চলে, কারণ সে আদ্যন্ত প্রকৃতি বশীভূত। বরং তার কল্পনা উধাও হয়েছে পঠন-পাঠন ও শ্রবণে, এবং সে যে অনেক দূরের স্বপ্ন দেখে তা তার অভিভূত হওয়ার ফলশ্রুতি, না পঠন-পাঠনের প্রভাব তা চট্ করে বলা মুস্কিল। অবশ্য সময় সময় অপুর মনোগত-ভাষণে স্বয়ং লেখকের চিন্তার স্পর্শ অতিমাত্রায় প্রকট হয় ব'লে অপুর চিন্তা-ভাবনা ও উধাও হওয়ার মতিগতি মধ্যে মধ্যে ঐ বালকের পক্ষে উপযুক্ত মনে হয় না, বালকের চিন্তা কল্পনা আকাশবিহারী হতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে দার্শনিকতার আমেজ লেগে যাওয়া খুব সম্মত মনে হয় না।

আসলে অপু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, না হলে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে শহরে চলে যাওয়ার মধ্যে তার জীবনের বা দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন ঘটে না, সে পূর্বাপর মোহ-মুগ্ধ বালকই থেকে যায়, বরং লোভ, কলহ ইত্যাদি মানুষী দুর্বলতা নিয়ে দুর্গা অনেক বেশী সজীব হয়ে থাকে আমাদের কাছে। দুর্গার ফলমুল কুড়ানো, পাড়ায় পাড়ায় টো টো ঘুরে বেড়ানো, চুরি করা, ব্রত পালন, ছড়া কাটার মধ্যে পল্লী সমাজের অস্তিত্ব-ই প্রমাণিত হয়, এবং লেখক-ও সেই সুযোগে গ্রাম বাংলার পূজা-পার্বণের ইতস্তত টুকরো টুকরো চিত্র সংযুক্ত ক'রে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

অবশ্য বিভূতিভূষণ আর একটি কৌশলে গ্রন্থটির উপন্যাস-ত্ব রক্ষা করেন, সেই কৌশলটি হচ্ছে পাত্র-পাত্রীর অতীত-রোমন্থন ও সময় সময় অতীত ঘটনার সরাসরি বিবরণ দান। ইন্দির ঠাকরুণের কঞ্চি কাটতে কাটতে অতীত চর্বণা, ছোট্ট শিশুর গান শুনে হরিহরের স্মৃতি রোমন্থন বা সর্বজায়ার ছোট্ট অপুর আচার আচরণ স্মরণ করা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বর্ণনার একঘেঁয়েমি দূর করে না, কাহিনীর অগ্রগতি মন্থর বা স্তব্ধ হয়ে এলে প্রায় ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মত এই অতীত রোমন্থন বৈচিত্র্য আনার সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার রাশ টেনে ধরে। ঔপন্যাসিক যতই আকাশ-বিলাসী হন না কেন তাঁর এক পা মাটিতে না থাকলে উপন্যাস রচনা করা সম্ভব নয়, কারণ উপন্যাসের কেন্দ্র হচ্ছে মানুষ—ব্যক্তি মানুষ, এবং যে মানুষ কখনোই সংসার বিমুক্ত স্বয়ম্ভু বা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীব নয়।

বিভূতিভূষণ এ-বিষয়ে যে অচেতন ছিলেন না তার প্রমাণ মেলে 'বল্লালী বালাই' অংশে। এখানে লেখক যা দেখা তা লেখা রীতি গ্রহণ না করে বাস্তববাদীদের মত নির্বাচনে আস্থা রাখেন। ইন্দির

ঠাকৃরুণের আস্তস্ত জীবনের কাহিনী না লিখে তিনি সতর্কতায় কখনো সরাসরি কখনো স্মৃতি-রোমন্থনের মাধ্যমে ইন্দির ঠাকরুণের জীবনের কারুণ্য তৎসহ বাংলাদেশের বল্লালী প্রথার নির্মমতা তুলে ধরেন, যদিও সেই প্রথা সম্পর্কে কোনও টিকা ভাষ্য করেন না, কারণ বাল বিধবা ইন্দির ঠাকরুণ যে সমাজে অপ্রয়োজনীয়, সে কেবল পরের গলগ্রহ মাত্র তা সর্বজায়ার নির্মম ব্যবহারে এবং হরিহরের নীরবতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের বংশে সেই প্রথার অবশেষ লুপ্ত হয় একথা ঘোষণা না করেও অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয় বলে 'ও বৌ, অমন করে বলিস্ নে—একটুখানি ঠাঁই দে আমারে —কোথায় যাবো আর শেষকালডা বল্ দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে —' ইন্দির ঠাকরুণের এ উক্তি শুধু মর্মান্তিক হয়ে ওঠে না, তা মর্মভেদী হয়ে ট্র্যাজিক মহিমায় উন্নত হয়, ফলে ইন্দির ঠাকরুণের চরিত্র মনে দাগ কাটে স্বাভাবিকভাবে। দুঃখ দারিদ্র্যের প্রচণ্ড প্রহার কত দুর্বিষহ হতে পারে তা ইন্দির ঠাকরুণের জীবনের প্রতিটি ঘটনায় লেখকের শিথিল সব বাক্য বিন্যাসের মধ্যেও ফুটে ওঠে, তার কারণ লেখক এখানে গ্রামসমাজের পরিপ্রেক্ষিতটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে বসেন নি, তাই অপু যে স্বয়ম্ভু কোনও জীব নয় ইন্দির ঠাকরুণের বিবরণের মধ্য দিয়ে তার পিতৃবংশের একজনের কঠোর বাস্তবচিত্র দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দেন, কিন্তু সে চিত্র বেশিক্ষণ ধরে রাখেন না লেখক এবং 'বল্লালী বালাই' অংশের বাস্তববাদের কাছাকাছি পদ্ধতি অবশেষে বিস্মৃত হয়ে বিভূতিভূষণ নির্বাচনের পরিবর্তে যাবতীয় দেখা জিনিস গ্রন্থভুক্ত করতে অতি উৎসাহী হয়ে পড়েন, অথচ সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে সেই অতি সংক্ষিপ্ত ইন্দির ঠাকরুণের অধ্যায়টি

বেদনায় তিক্ততায় আমাদের মনে স্মরণ্য হয়ে থাকে, কারণ সে বেদনা তাৎক্ষণিক নয়।

'আম আঁটির ভেঁপু' অংশে দুর্গাকে বাদ দিয়েও বিভূতিভূষণ গ্রাম জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরেন নানা গাল-গল্প, কিংবদন্তী, কখনো সখনো দু-একটি সরাসরি ঘটনার মাধ্যমে, কিন্তু এ সবের বেশীর ভাগ অপুর অপরিণত মনে যে কৌতূহল জাগায় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ফলে ঘটনা কিংবদন্তীর গভীরে না গিয়ে লেখক উপরিতলের ফলাফলে সন্তুষ্ট থাকেন, তাই তেমন তেমন বিবরণে সেই নির্মম অথচ অমোঘ বাস্তব ফুটে ওঠে না, যে বাস্তবতায় আমরা অপুর ক্রমবিকাশের ছবিটি ধীরে ধীরে দেখতে পেতাম। এইসব গাল-গল্প বা কিংবদন্তী নিশ্চয়-ই একটি বালকের মানসপরিমণ্ডল গঠনে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু ঐ প্রভাবে অপু কতখানি পরিণত হলো তার বিবরণ উহ্য থাকে ব'লে অপু-কে নানা জটিলতায় বা অপুর চরিত্রে পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-মিলনে সজীব হয়ে ওঠে না, যেন পুতুলের মত অপু সেই সব প্রভাব মেনে নেয়, তাই প্রায় একরৈখিক চিত্রে অঙ্কিত অপু উপন্যাসীয় মাত্রা পায় না।

আসলে 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশে লেখক অপুর বিকাশের চিত্র না এঁকে প্রকৃতি সম্বন্ধে এক মুগ্ধ বালকের ছবি রচনা করেন, বস্তুত প্রকৃতি ও মুগ্ধ বালকের ছবিও যদি তাঁর মূল উপজীব্য হতো, তবে ঐ ছবির মধ্যে সর্বদা না হলেও মধ্যে মধ্যে অপুর বিকাশ ও পরিণতির অবয়ব স্পষ্ট দেখতে পেতাম, কিন্তু বিভূতিভূষণ প্রকৃতির পিছনে অলৌকিক রহস্য আছে এ জগতের পিছনে আর একটা জগতের ছবি আছে জানার আগ্রহে ও সেই কৌতূহলে ক্রমে নিমগ্ন হওয়ায় দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতে নানা ধরনের অলৌকিক রহস্য ও শক্তির অস্তিত্ব সন্ধানে তৎপর হন, সেজন্য অচিরেই উপন্যাসের মানব-প্রত্যয় ভুলে

যান সেই রহস্য ও মায়ার বিহ্বলতায়; ক্রমেই তিনি দিব্যজ্ঞানী (থিওজফিস্ট) হয়ে ওঠেন।

তাই 'অক্রুর সংবাদ'-এর বিবরণ হয়ে ওঠে গতানুগতিক ও বর্ণহীন, কারণ এই অংশে প্রকৃতি প্রায় অনুপস্থিত ও তার কোনও ভূমিকা নেই, আছে শুধু মধ্যে মধ্যে অপুর গৃহ-কাতরতা, অর্থাৎ শহরের নিষ্করুণ জীবনে অতিষ্ঠ হবার ছবি, যদিও শহরের যে নিষ্কারুণ্য নির্মমতা অপুকে নিশ্চিন্দিপুর সম্পর্কে বার বার ভাবাতে পারে, সেই আলেখ্য প্রায় অনুল্লিখিত, যে দু-একটি হৃদয়-হীনতার ঘটনা আছে তা যে কোনও লোকের পরের বাড়ি থাকার অভিজ্ঞতার বেশী নয়।

শহর সম্পর্কে বিভূতিভূষণের দ্বিধা ও সংশয় বা শহরের বিশেষ চরিত্র তার নজর এড়ায় ব'লে 'অক্রুর সংবাদ' ভাগটি দ্বন্দ্ব জটিলতায় বা অপুর সামঞ্জস্য স্থাপনের সমস্যায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে না, অথচ একজন প্রকৃতি-মুগ্ধ বালকের বেলায় তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। বরং যেখানে অপুর রোমান্টিক মন পুষ্ট হয়, ঠিক সেইসব জায়গাগুলো যেমন হরিহরের কথকতার বিবরণ আমাদের মন স্পর্শ করে, যেমন স্পর্শ করে হরিহরের মৃত্যুর পর অপুর 'কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং' মনে হওয়ার সংক্ষিপ্ত অনুভবটি।

রবীন্দ্রনাথের সরল কবিতা 'বধূ'তে রাজধানীর পাষাণ কায়া এমনভাবে একজন গ্রাম্য বধূকে পিষ্ট করে, যার ফলে তার কেবলি মনে পড়ে 'দিঘির সেই জল শীতল কালো,/তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।' বধূর হাহাকারে দীর্ণ মনটি আমাদের ভাবিয়ে তোলে খুব সরলভাবে, তেমন ভাবে অবশ্য নিশ্চিন্দিপুর ফেরার আকুলতায় অপু আমাদের ব্যথিত করে না। 'তাহার ভালো লাগে না, মোটেই ভালো লাগে না। শহরের এইসব ইট-সিমেন্টের কাণ্ড-কারখানায়

তাহার হাঁফ ধরে, কেমন যেন দম আটকাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাব।' অপুর এই অনুভবের পাশে বধূর অনুভব অনেক বেশী আন্তরিক ও অকৃত্রিম—'কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে,/খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।/হেথায় বৃথা কাঁদা,/দেয়ালে পেয়ে বাধা/কাঁদন ফিরে আসে আপন—কাছে॥/আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে,/অবাক হয়ে সবে কারণ খোঁজে।/'ইত্যাদি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ এই সহজ কবিতাটিতে দুটি বিপরীত চিত্র রচনা ক'রে দেখান বধূর সহজ স্বাভাবিকতা কিভাবে ব্যাহত হচ্ছে শহরে, অপুর চিত্র তেমন বৈপরীত্যে স্থাপিত নয়, তাই ঈপ্সিত আকুলতার গভীরতা তো দূরস্থান অপুর দ্বিধা-দীর্ণ হওয়ার আলেখ্য চোখের আড়ালে থেকে যায়, আর তা হয় ব'লে শেষ পর্যন্ত আমরা অপুর ভাবালুতায় ও লেখকের দার্শনিক সুলভ প্রবচনে 'পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন……'একটি মহৎ উপন্যাসের এ ধরনের পরিণতিতে ক্ষুব্ধ হই।

আসলে বিভূতিভূষণ অপুর ক্রমবিকাশের কাহিনী প্রথমে উপজীব্য করেও অবশেষে এক স্থির চিত্র রচনা করেন, কেবল তাই নয় দুর্গার ঐ জ্বলজ্বলে চিত্রের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যে অলোকদৃষ্টি আরোপ করেন তা দুর্গার চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন মনে হয়। 'কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনো আসে নাই। দিন রাতে, খেলাধুলার, কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে একথা তাহার প্রায়ই মনে হয়……ঠিক সে বুঝিতে পারে না, তাহা কি, কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে·· আসিতেছে··· শীঘ্র আসিতেছে···'(বিংশ পরিচ্ছেদ)। মৃত্যুর পূর্বে এ ধরনের

অনুভূতি 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর অলোকদৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে, এবং মরণের পর জীবন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ যে অতিশয় হয়, তা ঐ পথ অতিবাহন ক'রে 'দেবযান'-এ উপনীত হয়, অর্থাৎ 'দেবযান'-এ প্রস্থানের পথ লেখক হঠাৎ খুঁজে পান নি, তার বীজ 'পথের পাঁচালী'-তে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে।

দুর্গার মৃত্যুর আগে ষষ্ঠেন্দ্রিয় সুলভ চেতনা ছাড়াও অতি-প্রাকৃত জগতের সঙ্গে অপুর প্রথম যোগের কথার স্বীকৃতি আছে 'অপরাজিত' উপন্যাসের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে—'এই জগতের পিছনে আর একটা যেন জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখির ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবন-যাত্রা—তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূর দিগন্তের বহুদূর ওপারে কোথায় যেন সে জগৎটা—পিঁয়াজের একটা খোসার মধ্যে যেমন আর একটা খোসা তার মধ্যে আর একটা খোসা, সেটাও তেমনি এই আকাশ, বাতাস, সংসারের আবরণে কোথাও যেন ঢাকা আছে, কোন্ জীবনপারের মনের পরের দেশে। স্থির সন্ধ্যায় নির্জনে একা কোথাও বসিয়া ভাবিলেই সেই জগৎটার একটু একটু নজরে আসে।' এই জগতের সঠিক অবস্থান ও প্রত্যয় গ্রাহ্যতা সম্পর্কে অপুর বকলমে স্বয়ং লেখকেরই বোধহয় কিছু সংশয় আছে, অথচ সেই জগৎ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের আগ্রহ না কমে বরং বেড়েই যায়, এবং স্বীকারে কুণ্ঠা নেই উপন্যাসে প্রত্যয় গ্রাহ্য জগতের আবেদন মূল ও মুখ্য। অলোকদৃষ্টি বা অতি-প্রাকৃত জগৎ নিয়ে উপন্যাস লিখলেও সেই জগৎ-কে লেখায় অনিবার্য বা বিশ্বাস্য করে তুলতে হয়, না হলে লেখকের কথা একমাত্র গ্রাহ্য হলে সে উপন্যাসের কপাল মন্দ তা বলা বাহুল্য। তাই 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লেখকের পরের রচনা হলেও তা পাঠকের কাছে বিশ্বাস্য বা প্রত্যয় গ্রাহ্য কোনটাই হয়ে ওঠে না, বরং জিতুর চেয়ে অপু অনেক বেশী

ভাবালু হয়েও হয়ত অতিমাত্রায় অ-প্রাকৃতিক ভাবে বিভোর নয় ব'লে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'পথের পাঁচালী' গ্রন্থে দিব্য বা অলোকদৃষ্টি ষষ্ঠেন্দ্রিয় চেতনা বা অ-প্রাকৃত জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল থাকলেও তা মাত্রাতিরিক্ত নয়, উপরন্তু লেখক নানা ভাবে কাহিনীটিকে বারে বারে মাটির দিকে টেনে আনেন, ফলে রূপকথাময় গদ্য আলেখ্যটি অবশেষে উপন্যাসের কাঠামোয় বাঁধা পড়ে, এবং স্বীকারে কুণ্ঠা নেই যে 'আম আঁটির ভেঁপু' অংশে উপন্যাসটি শেষ হলে তার উৎকর্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতো, কারণ 'অক্রুর সংবাদ'-এ যে কাহিনী বর্ণিত তা অপুব প্রায় বয়ঃসন্ধির কাহিনী, যা 'অপরাজিত' উপন্যাসের ভূমিকারূপে যুক্ত হলে কোনও ক্ষতি ছিল না। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস তবু আমাদের মনোযোগী পাঠের বস্তু তার ত্রুটি দুর্বলতা সত্ত্বেও, কারণ লেখক এখানে বাংলার পল্লীগ্রামের এক তন্ময় চিত্র এঁকেছেন যে চিত্র না হলে আমাদের গোচরীভূত হতো না কোনদিন আর। অন্যপক্ষে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস বিভূতিভূষণকে চিহ্নিত করেছে এক বিশেষ ধরনের লেখক হিসাবে, এই উপন্যাসের সবলতা দুর্বলতা-গুলি তাঁর অন্য উপন্যাস-কে স্পর্শ করেছে, অবশ্য 'পথের পাঁচালী'-র মত তাঁর আর কোনও উপন্যাসই আমাদের মতে এতখানি সফলতা লাভ করে নি। 'পথের পাঁচালী'-র এইসব বিশেষত্বব জন্য বিভূতি-ভূষণের প্রধান ও প্রতিভূস্থানীয় উপন্যাস হিসাবে গণ্য।

৮

'পথের পাঁচালী'-র জগৎ তবু সমাজ সংসার বিমুক্ত নয় যতই অপু আকাশবিহারী হোক না কেন, বিশেষ করে দুর্গা এবং তারপর

সর্বজায়া হরিহরের কাহিনী অপু নামক ঘুড়িকে মর্তের দিকে টেনে আনে। অপুর প্রতি সর্বজায়ার ভালোবাসা, প্রতিবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে হরিহরের আশার কথা শোনানো, এবং তাতে সর্বজায়ার মন উদ্দীপ্ত হওয়ার মধ্যে সেই মানুষী সবলতা দুর্বলতা খুঁজে পাই, যার বলে রূপকথামূলক ইতিবৃত্ত-ও উপন্যাসে উন্নত হয়। কিন্তু 'আরণ্যক'-এর জগৎ মূলত ও মুখ্যত নিরেট প্রকৃতি অধ্যুষিত, এবং এখানে যে সব নর-নারীর চিত্র আঁকা হয় তারা অনেকটা প্রায় নিমিত্তমাত্র পর্যায়ের, অথচ 'আরণ্যক'-এর বিষয়-বস্তুতে বিরাট ও মহৎ উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল, কারণ বন কেটে বসত বসানো কথায় সহজ সরল মনে হলেও জঙ্গল মহাল প্রজাদের মধ্যে বিলি করার ঘটনায় একদিকে অরণ্য বনানীর উৎখাত অন্যদিকে সেই অরণ্য উৎখাতের সময় মানুষের প্রায় অ-মানবিক সংগ্রামের আলেখ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বন কেটে বসত বসানোর অভিপ্রায়ে বহু লোকের গমনাগমন, তাদের বিচিত্রধরন—লোভ পাপ আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি-র সঙ্গে বিশেষত বিহারের এক অরণ্যময় অতি অনুন্নত জায়গার বসতি স্থাপনের কাহিনীর মধ্যে গরীব ও বড়লোকের বিচিত্র ভূমিকা এসে পড়ে কাহিনীকে আরও জটিল করে তুলতো, যে জটিলতায় অরণ্য প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ ও মিলনের চিত্র ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে; কারণ বন কেটে বসত স্থাপনের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট, অথচ সেই কাজ যে প্রায় অসাধ্যসাধন এবং তা সম্পন্ন করতে অমানুষিক শ্রম ও সংগ্রামের দরকার সে বিষয়টি যে কোনও লোকের বোধগম্য হয়, এ এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম প্রকৃতি-কে আয়ত্তে আনার, এবং আধুনিক মানুষ প্রকৃতির উপর নিজের প্রভুত্ব বিস্তারে অতি তৎপর, আর তাই সেই আবেগ ঐ গল্পে প্রতিফলিত হলে উপন্যাসটি

সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মানুষের একটা আবেগের রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠত আমাদের সামনে।

প্রকৃতি মানুষ-কে প্রভাবিত করে, এবং নিসর্গের সম্মোহনে মুগ্ধ মানুষ বহু কাল ধরে প্রকৃতি ভজনা করে এসেছে নানা সঙ্গীত ও কবিতায়, তার ফলে শিল্প সাহিত্যে প্রকৃতির উপর মানবিক গুণ আরোপিত হয়েছে বার বার, নরত্বারোপ (personification) মানুষের আবেগের এক প্রাচীন উদ্ভাবন।) কিন্তু সেখানে মানুষ প্রকৃতির চেয়ে কিছুটা হেয়, যেন প্রকৃতি সর্বশক্তিমান, মানুষ তার কাছে অসহায়। অবশ্য এ ধারণার পরিবর্তন হতে শুরু করে ধীরে ধীরে, ক্রমে মানুষ নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে থাকলে প্রকৃতি হয়ে ওঠে তার সখা, হয়ত সমব্যথী বা বড়জোর দরদী শিক্ষক।) রুশো এবং তারপরে বিশেষত শিল্প-বিপ্লবের পর প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া, প্রকৃতি মানুষের শিক্ষক বা প্রকৃতির শিক্ষা আসল ও সম্পূর্ণ ইত্যাদি উচ্চারিত হতে শোনা যায়। এই সব উচ্চারণে অবশ্য মানুষ-কে হেয় করা হয় না, তবু যন্ত্রের আধিপত্যে বিদ্রোহী মন প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে চায় মানুষের অহেতুক বৈষয়িকতা লক্ষ করে, কিন্তু এ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রম প্রসারে—তার জয়যাত্রায়। বিজ্ঞান মানুষের শক্তিকে অসীমের দোর গোড়ায় প্রায় নিয়ে গেছে, এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের স্পৃহা তার বেড়েই চলে, এবং এই স্পৃহা যে আধুনিক মনের এক অভিব্যক্তি তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যে আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রসার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা আধুনিকতার মৌল বৈশিষ্ট্য সেখানে প্রকৃতি-কে কেন সমস্ত কিছু-কে জানার ও জয় করার মানুষী স্পর্ধা অঙ্গীকৃত হয়ে যায়, ফলে প্রকৃতির দিক থেকে মুখ ফেরানো নয়, তার নিয়ম কানুন জেনে তাকে স্ববশে আনার ইচ্ছা এবং সংগ্রামই

হচ্ছে প্রকৃতির ক্ষেত্রে মানুষের আধুনিক প্রত্যয়। বিভূতিভূষণ ঠিক এর উল্টো পথ-ই অতিবাহন করেন।

বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি হচ্ছে স্বয়ং সম্পূর্ণ, যার সঙ্গে মানুষের কোনও যোগ নেই, যোগ থাকলেও সে যোগ কেবল প্রকৃতির প্রভুত্ব ব্যাপারে, মানুষ তার প্রতি বিমুগ্ধ ও অভিভূত এই মাত্র। মানুষকে প্রকৃতির কোনও প্রয়োজন হয় না, প্রকৃতি নিজেই এক জীবন্ত সত্তা, যে সত্তা কেবলি মানুষকে সম্মোহিত ক'রে নিসর্গের পিছনে আর এক রাজ্যের খবর এনে দেয়। মানুষের মহিমায় প্রকৃতি মহৎ নয় তাঁর কাছে, প্রকৃতি নিজেই মহৎ, তাই মানবিক কোনও গুণ আরোপ করে তাকে জীবন্ত বা মহৎ করার দরকার নেই। অর্থাৎ বিভূতিভূষণ প্রকৃতির বশ্যতাই মেনে নেন নানা ভাবে, অবশ্য কিসের প্রতিক্রিয়া তিনি প্রকৃতি প্রেমিক হ'ন সে-বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই, যন্ত্রশিল্পের প্রসারে বা মানুষের বৈষয়িকতার অতিশয়তা দেখে ক্লিষ্ট হয়ে প্রকৃতির দিকে ফেরার মধ্যে একটা সচেতন মনের গতি-প্রকৃতি বোঝা কঠিন নয়, এবং সেভাবে একান্ত বিরক্ত হয়ে প্রকৃতি-তে ফিরে যাবার মধ্যে আধুনিক জীবনের অন্তত একটি প্রতিক্রিয়ার বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠতো আমাদের সামনে, কিন্তু বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে তেমন জোরদার প্রতিক্রিয়ার ছবি অনুপস্থিত, ফলে তাঁর প্রকৃতিস্তুতি ঠিক আধুনিকতার পর্যায়ে পড়ে না, অথচ প্রকৃতি অনুরক্ত জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতি-কে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবনের বিড়ম্বনা কথা ভোলেন না, তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন প্রকৃতি-কে ভালোবেসে ফেলে-আসা অর্থাৎ প্রাক্তন জায়গায় ফিরে আসা যায় না, তাই তাঁর গল্পে ('গ্রাম ও শহরের গল্প') প্রকৃতি সর্বৈব না হয়ে একই সঙ্গে প্রকৃতি-তে প্রত্যাবর্তনের স্পৃহার সঙ্গে সেখানে ফিরে গেলে ঈপ্সিত জিনিস পাওয়া যায় না

এমন সংশয় স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং জীবনানন্দ ঐ গল্প এক রেখায় আঁকেন না ব'লে গ্রাম ও শহরের বৈপরীত্য ফুটে উ'ঠে দু নর-নারীর দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক করে দেয় অনায়াসে, তাই তাঁর গল্প হয়ে ওঠে আধুনিক, প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত অথচ অমোঘ কাব্যিক বর্ণনা সত্ত্বেও।

'আরণ্যক' অরণ্য নিয়ে লেখা গ্রন্থ, যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির স্তুতিতে ভরপুর, প্রকৃতি এখানে প্রায় দেবত্বের মহিমায় অধিষ্ঠিত, এবং গল্পকার তার একান্ত বিনীত দাস, যেজন্য জঙ্গল মহাল বিলি করার মুল বিষয়টি হয় উপেক্ষিত, বদলে পাই এই সব উক্তি :

ক) '***সেখানকার প্রান্তর সীমার বনানী অতি শোভাময়ী, কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় আসিবার সময়ে সে বন দেখিয়া মনে হইয়াছে, জগতের মধ্যে নাঢ়াবইহারের এই বন একটা বিউটি স্পট— গেল সে বিউটি স্পট।' (নবম পরিচ্ছেদ, ৪)।

খ) 'কি অবর্ণনীয় শোভা দেখিলাম এই বনভূমির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে! কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়াবইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালোবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুশ্রী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়াবইহার, ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য ও দূর বিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে?' (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, ৩)

গ) "প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়ো ঝাঁকার নিভৃত লতা-বিতান, কত

স্বপ্ন ভূমি—জন-মজুরেরা নির্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল একদিনে।**

নাঢ়াবইহারের নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তিমাত্র। যে দিকে চোখ যায়, শুধু চালে চালে লাগানো অপকৃষ্ট খোলার ঘর।**

ধরণীর মুক্তরূপ ইহারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে।' (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ৫)।

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিসমূহ প্রায় অন্তঃসারশূন্য উক্তির পর্যায়ে পড়ে, কারণ বন কেটে বসত গড়ার পর কেন কুশ্রী খোলার চাল ওঠে, কেন দারিদ্র্য সেখানে বাসা বাঁধে, বা জমিদার জমি বিলি করার জন্য কেন ব্যস্ত হন, কেন-ই বা লেখক আরণ্যক প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হয়েও সেই অরণ্য বিলি করেন অথচ চাকরিতে ইস্তফা দেন না ইত্যাদি অসংখ্য কেন-র কোনও উত্তর বা উত্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। লেখক চোখের সামনে যা দেখেছেন যে ঘটনা যে রকম ঘটেছে ঠিক তাই লিখতে চেষ্টা করেছেন, যে রীতি যথাযথবাদীদের রীতির প্রায় কাছাকাছি, এবং যথাযথবাদে কোন সময় প্রকৃত বাস্তব তুলে ধরা যায় না।

এমন কি 'দিন যত যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল' তা দেখানোর জন্য 'এ মনের ভাব একদিনে হয় নাই। কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া ভুলাইল!' এমন সহজ উক্তি সেজন্য যথেষ্ট নয়, কারণ একজন শহুরে লোকের পক্ষে শহরের অভ্যাস ভোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়, এবং ঐ ভোলার কাণ্ডে নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার চিত্রটি অনুল্লেখ থাকলে সমগ্র চিত্রটি প্রায় বায়ুভুক পর্যায়ে উপনীত হয়। 'কপাল কুণ্ডলা' বা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'

উপন্যাসে এক পরিবেশ থেকে ভিন্ন পরিবেশে উপস্থিত নায়িকা বা নায়কের সামঞ্জস্য স্থাপনের সমস্যা প্রায় রক্তাক্ত পর্যায়ে তুলে আনা হয়, এবং উক্ত উভয় উপন্যাসের সবলতা সেখানেই, কিন্তু 'আরণ্যক'-এ বিভূতিভূষণ সামঞ্জস্য স্থাপনের সমস্যাটি পুরোপুরি এড়িয়ে যান, ফলে 'আরণ্যক' প্রকৃতি মুগ্ধ এক ব্যক্তির উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়, যে পুস্তকে 'হে অরণ্য. হে সুপ্রাচীন, আমায ক্ষমা' করিও!' 'হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী', 'বিদায় সরস্বতী-কুণ্ডী বিদায়', 'হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায। বিদায়!' প্রভৃতি ভাবাবেগে আপ্লুত মন্তব্য সকল প্রায় পরিচ্ছেদে একাধিকবার পাওয়া যায়।

আমরা এতক্ষণ শুধু 'আরণ্যক' এব নেতিমূলক সমালোচনা করেছি, এবং বারবার জোর দিয়েছি সেইসব বিষয়ের উপর লেখক যেগুলি সচেতনে কখনো বা অনিচ্ছায এডিয়ে গেছেন; অতএব আমাদের আলোচনা সম্পর্কে পক্ষপাতেব কথা ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা বার বার তাঁর এড়িয়ে যাওয়া বিষয়ের উপর জোর দি এইজন্যে যে ঐ বিষয়গুলি ছিল যথার্থ উপন্যাসের বিষয, যার অভাবে আলোচ্য গ্রন্থটি পঙ্গু হযে পড়ে। স্বভাব-কবিত্বের জোবে কিছুদূর এগুনো যায় হয়ত, কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের সাফল্যের জন্য মননের চর্চাও প্রয়োজনীয়, না হলে ঐ মননশীলতাব অভাবে তা ক্রমে 'দেবযান'-এর দিকে ঔপন্যাসিককে ঠেলে নিয়ে যাবে অনিবার্যভাবে, এবং 'দেবযান' আর যাইহোক উপন্যাস নয়।

আসলে 'আরণ্যক' গ্রন্থে ঔপন্যাসিকের বিষয়মুখ দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়-সর্বৈব বিসর্জিত হয়, তাই ভানুমতী উপাখ্যান বা কুন্তার কথা শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে উঠে লেখকের আত্মমুখী চিন্তা ভাবনাকেও ভাবালুতায় পর্যবসিত করে। কেবলমাত্র প্রকৃতি বর্ণনার সরসতা বা

স্তুতি যে একজন দক্ষ-লেখককে ঔপন্যাসিক হবার পথে বিঘ্ন ঘটায় তার প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থটি। অবশ্য বিভূতিভূষণের আদ্যন্ত লেখক জীবন অনুসরণ করলে তাঁকে মহৎ ঔপন্যাসিক হিসাবে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তিনি অলৌকিক ও রহস্যময় ঘটনায় যত আকৃষ্ট হয়েছেন, মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনীতে তত আকর্ষণ বোধ করেন নি, অথচ তাঁর রচনায় গরীবদের প্রতি অনুকম্পার নিদর্শন ছত্রে ছত্রে আছে, সেটা তাঁর সদাশয়ত্বের পরিচয়, ঔপন্যাসিকত্বের নয়। বিভূতিভূষণ আন্তরিক অকৃত্রিম লেখক হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিত হলেও তিনি বড় ঔপন্যাসিক নন—একথা স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত নই। অবশ্য তিনি দিব্যজ্ঞানী ছিলেন, এবং দিব্যজ্ঞানী ও ঔপন্যাসিকের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা—মৌলিকভাবে আলাদা। নাকি উভয়ের মেল বন্ধন কখনো সম্ভব ?

নীতি উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ী

বাংলাদেশে রাজনীতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা বোধহয় অসম্ভব, বিশেষ ক'রে স্বদেশী আন্দোলনের পর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছাড়াই কোনো-না-কোনোভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এ বিষয়ে তার অনীহায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্পৃহাই প্রতিফলিত ; ফলে রাজনীতি অশ্রদ্ধ ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় থেকে রাজনীতিতে অংশ নেন পরোক্ষভাবে, হয়ত এই অশ্রদ্ধা বা নিষ্ক্রিয়তা তার ছদ্মবেশ। রাজনীতি জীবন-অতিরিক্ত বা জীবন-বর্জিত কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়, তথাকথিত নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের মতে তা মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর ক্ষমতাদখলের চালাকি হওয়া সত্ত্বেও। আমাদের খাওয়াপরা-জাতীয় বাঁচার ন্যূনতম সমস্যা এখনও তীক্ষ্ণ ও জ্বলন্ত, সেজন্য এদেশে রাজনীতি শৌখিন পোশাক নয়, যা যখন খুশি পরা বা খোলা চলে, কারণ রাজনীতি আমাদের বাঁচামরা প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, এমনকি আমাদের চিন্তাভাবনা আবেগ প্রভৃতি আত্মমুখ ব্যাপারগুলি বিলাসীদের কাছে স্বসমুখ ব'লে মনে হলেও আসলে তা কোনো-না-কোনো সূত্রে সমাজ বা বৃহত্তর জীবন ও জীবনসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। আর জীবনসংগ্রামের মূর্ত ঘটনাবলি বা কাজ রাজনীতি নামে চিহ্নিত।

তাই জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বহুবিধ আবশ্যকীয় কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত রাজনীতি কোনো বাইরের বিষয় নয় ; মানুষ রাজনৈতিক জীব—অ্যারিস্টট্‌ল মানুষ সম্বন্ধে সে-কথাই বলতে চেয়েছিলেন। অথচ সাহিত্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ অথবা রাজনীতি ও সাহিত্যের

পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের সংশয়ের অন্ত নেই। অনেকের ধারণা রাজনীতির সংস্পর্শ সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর, যেহেতু সাহিত্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ সফল সৃষ্টির সহায়ক নয়। জীবনের জটিল ঘটনাবলি-সম্পৃক্ত রাজনীতির কথা বাদ দিলেও আন্দোলন-কেন্দ্রিক সমসাময়িক সমাজের আলোড়ন বিক্ষোভ ইত্যাদি, প্রচলিত তরল ও সীমিত অর্থে রাজনীতির ব্যবহার, সাহিত্যে সুপ্রাচীন। অন্তত মহৎ লেখকেরা এ বিষয়ে আমাদের অনেকের মতো ছুৎমার্গী ছিলেন না—ইস্‌কাইলাস্‌, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি তার প্রমাণ। প্রাচীন সময়ে তো বটেই, বর্তমানেও রূপক, অতিকথা-র ('মিথ') মাধ্যমে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সমালোচনা করা লেখকদের একটি প্রিয় কৌশল। এমনকি নীতিকথা প্রচারের ছলে বলবান অত্যাচারী মদগর্বীর বিরুদ্ধে বা তাদের পতন-কাহিনী বর্ণনা করতে কবি সাহিত্যিকরা কুণ্ঠিত হন নি। সেই একই আবেগ ও উদ্দেশ্য থেকে ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে সাহিত্য-রচনার নজির নেহাৎ কম নয়। হয়ত এসব রচনা লেখকের পলায়ন-মনোবৃত্তির পরিচায়ক, তবু অতীতে প্রস্থান শুধু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই লেখকের অভিপ্রেত নয়, দেশের লুপ্ত গৌরব ও আহত মর্যাদা পুনরুজ্জীবনের আকৃতি সেই পলায়নে ধরা পড়ে। অন্তত দেশের অন্ধকার ও গ্লানির সময় এসব রচনা প্রচ্ছন্নভাবে কখন বা প্রত্যক্ষভাবে জাগিয়ে তোলে সুষুপ্ত জাতিকে।

সরাসরি না হলেও খিড়কির দরজা দিয়ে যেকোনো অজুহাতে রাজনীতি, সীমিত অর্থে আন্দোলনভিত্তিক রাজনীতিও সাহিত্যে ঢুকে পড়ে। সুখের বিষয় বাংলাসাহিত্যে রাজনীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না, আর বাংলা উপন্যাসে সূচনা থেকে আন্দোলনভিত্তিক রাজনীতি অনেক ঠাঁই জুড়ে না নিলেও অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল না, যদিও

রাজনীতিকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা উনিশশো ত্রিশের পরের ঘটনা, যখন মধ্যবিত্তশ্রেণী-পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বা সমান্তরালে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়েছে। তবু একথা স্বীকারে লজ্জা নেই যে, বাংলাদেশে রাজনীতি ছিল শহরকেন্দ্রিক, এবং আদি-স্তরের আবেদন-নিবেদন থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী সময়ের অসহযোগ কিংবা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পর্যন্ত আমাদের রাজনীতির পরিচালক ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী—বোধহয় ইংরেজিশিক্ষিত বিত্তশালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বলাই সঠিক। সাম্যবাদী আন্দোলনও অদ্যাপি সেই মধ্যবিত্তিক নাগপাশ ছিন্ন করতে পারে নি আশ্চর্যের কথা, সেই একই অভিযোগ বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে করলে, তার মধ্যে কিঞ্চিৎ অতিভাষণের দোষ বর্তালেও অভিযোগ সম্পূর্ণ অসিদ্ধ হয় না। বরং আমাদের সমালোচকরা বারবার গ্রাম-বাংলার চিত্র, গ্রামের লোকজন, গ্রাম সমাজ ইত্যাদি সাহিত্যে অবহেলিত থাকে ব'লে যে চিৎকাব করেন, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে, যেটুকু চেষ্টা হয়েছে, তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর অথবা বর্ণহীন, একঘেয়ে। বাংলাসাহিত্য এখনও উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত-লেখকদের হরিহব-ছত্র। অধিকাংশ লেখকই শহরের অধিবাসী, এবং তাদের সকলের দৃষ্টি কলকাতা অভিমুখে। এক তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বা লিখেছেন; কিন্তু তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের লেখায় প্রকৃত গ্রাম কত গভীরে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিবেচনাযোগ্য; নাকি সে লেখাগুলিতে মধ্যবিত্ত শহুরে মনের রোমান্টিকতা, আরোপিত ভঙ্গি এবং কেবলমাত্র নিছক প্রকৃতি-ই প্রকাশিত?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্করের কয়েকটি উপন্যাস ভরসাস্থল এইমাত্র: বিভূতিভূষণের নিষ্ঠা ও সহানুভূতি যেকোন লেখকের

দৃষ্টান্তস্থল হলেও সেপথ অতিবাহন করা আত্মহননের সামিল। তৎকালে এবং তারপর যাঁরা গ্রাম নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, তাঁদের কোনো কোনো প্রচেষ্টা উল্লেখ্য হলেও সাধারণভাবে বলা চলে যে, বাংলা উপন্যাসে বৃহত্তর সমাজের চিত্র আজও অবহেলিত রয়েছে ; সেজন্য অবশ্য ঔপন্যাসিকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ ঔপন্যাসিক যে-সমাজে জন্মেছেন এবং যে পরিবেশে বড় হয়েছেন, সেই সমাজ ও পরিবেশ তাঁর রচনায় যত বাস্তব হয়ে উঠবে, দু-একদিন ঘুরে, ভ্রাম্যমানের চোখে গ্রাম দেখে বা কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রাম্য প্রবাদ প্রবচন এবং শব্দ চয়ন ক'রে ও মোটামুটি চাষীদের আচারব্যবহারের একটা ছবি ভাসিয়ে নিয়ে উপন্যাস রচলে তা ততখানি জোলো হবে সন্দেহ নেই।

সুতরাং সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে আমাদের লেখকরা যে তাঁদের সীমিত গণ্ডির মধ্যে চলাফেরা করেন তা প্রশংসনীয়, যদিও প্রকৃত উপন্যাস লিখতে গেলে সেই বৃহত্তর জনসমাজ, তার যথাযোগ্য পটভূমি ও পরিবেশ উপেক্ষা করলে চলে না, কারণ বাংলাদেশ এখনও গ্রামপ্রধান। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শহর গ্রামের উপর নির্ভরশীল হলেও অদ্যাপি গ্রাম ও শহরের উন্নতির অ-সম হারের মধ্যে কোনো সেতু নির্মিত হয় নি। বরং বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী উন্মুল ব'লেই এই শ্রেণী ঐতিহ্যের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন—তার এক পা আকাশে, অথচ অন্য পা-টি মাটিতে যুক্ত নয়। ফলে আমাদের দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণী-ভিত্তিক ও কেন্দ্রিক রাজনীতি আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। তদুপরি কলকাতা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অবস্থা আরও জটিল ক'রে তোলে। তাই গ্রামের ছেলে শহরে শিক্ষা সেরে গ্রামে ফিরতে ভয় পায়—যে-সমস্যাটি

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিকবাবু অনবদ্য ক'রে তোলেন।

এ সংকট শুধু গ্রামের ছেলের নয়, শহরের ছেলে—বিশেষত কলকাতার ছেলে—কলকাতা ছেড়ে অন্য শহরে যেতে অনিচ্ছুক। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বলতে পারি যে, গ্রাম ও শহরের ব্যবধান শুধু যোজন-যোজনের নয়, আমাদের উভয় মনের মিলনের সম্ভাবনা কম, এবং সুষ্ঠু বিকাশের অভাবে উভয় মন-ই বিকৃত হয়ে গেছে। এতে পরিতাপের অন্ত নেই। তবু রাজনীতির যে-চাপে শহর গ্রামের বিকাশ সুসম হতো, অথবা মধ্যবিত্ত গণ্ডি অতিক্রম ক'রে আমাদের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মিলিয়ে দিত, সেই চাপ বা কার্যক্রম আমাদের কোনো রাজনৈতিক দলই সঠিকভাবে গ্রহণ করে নি। আর বাঙালি লেখক এসব বিষয়ে গভীর চিন্তা করেছেন, তার নজিরও যথেষ্ট নেই। রাজনীতি শিল্পসাহিত্যকে প্রভাবিত করে, সাহিত্যশিল্পও রাজনীতির গতি পরিবর্তন করে, কিন্তু বাংলাসাহিত্যে প্রথমটি ঘটলেও উল্টোটি ঘটে নি বললেই চলে। জনসাধারণ কিছু-কিছু গান বা কবিতায় উদ্বুদ্ধ হলেও তাদের চেতনার জাগরণ কবিতা বা গানের জন্য হয় নি—ঐ গান বা কবিতা তাদের চেতনা আরও তীক্ষ্ণ, উদ্দীপ্ত করেছে মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে যে-বাংলাসাহিত্যেব আরম্ভ, সেই সাহিত্যের রথীমহারথীদের অনেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং স্বদেশী ভাবনায় ভাবিত হন নি এমন লেখক পাওয়া সত্যি দুষ্কর। অথচ সমগ্র জীবনের সঙ্গে রাজনীতিকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা ও তৎসূত্রে সাহিত্যে সেই মিলিয়ে নেবার বিশ্বাস ক-জনের লেখায় বর্তমান, তা ভাববার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের প্রযত্ন এক্ষেত্রে নিশ্চয় উল্লেখ্য, কিন্তু তাঁর রচনাবলি রাজনীতির মোড়

ফিরিয়েছিল—এ তথ্য আমাদের হাতে নেই। যদিও তাঁর অনেক রচনার ভবিষ্যদ্বাণী বা দৃষ্টি আমাদের হতচকিত করে সময়-সময়। ফরাসি বিপ্লবের আবহাওয়া সৃষ্টিতে ও গতিবেগ সঞ্চারে লেখকদের অবদান ছিল যথেষ্ট। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সেইসব লেখক না জন্মালে ফরাসি বিপ্লব সম্ভব হতো না, তার মানে এই যে সেই বিপ্লবে লেখকদের ভূমিকা লেজের দিকে ছিল না।

বাংলাদেশে কবিসাহিত্যিকরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন জনতাকে, কিন্তু নেতৃত্ব দিতে পারেন নি কোনো সময়। এজন্য লেখকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই, কারণ আমাদের দেশের সমস্ত ব্যাপারই ঘটেছে অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে—যার মূল খুঁজতে গেলে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজদের ভারতজয়ের সঙ্গে যে সার্বিক বিপর্যয় ঘটে, সেখানে আঘাত করতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সে আলোচনার স্থান নেই। যা হয় নি, যা হতে পারত বা আমাদের কি করণীয় ছিল ইত্যাদি আলোচনা নিছক জল্পনা-কল্পনা স্তরের। বাস্তব ঠিক আমার মনমতো চলবে—এমন চিন্তা কেবল করতে পারেন রাজা ক্যানিউট। সে জন্য সমালোচকের উচিত যা ঘটে গেছে তারই উপর নির্ভর ক'রে আলোচনায় এগুনো।

একথা ঠিক যে, রাজনৈতিক নেতাদের মতো আমাদের বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পীরা শ্রমিক কৃষকদের উদ্দীপ্ত করতে পারেন নি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগ যার মাধ্যমে, সেই সংযোগ মাধ্যম ভাষা। একের ভাষা অপরের কাছে এতই অপরিচিত যে সময়-সময় ধন্ধ লাগে উভয়ে এক দেশের এক ভাষার মানুষ কিনা। অথচ শেষোক্ত-র কাঁধে পা দিয়েই তো দেশের বৈষয়িক বা আত্মিক উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব। মধ্যবিত্ত লেখকের শহর-ভিত্তিক জীবন আবার অন্যদিকে এত গণ্ডিবদ্ধ যে, ঠিক তার পাশেই বাড়ি বা বস্তিতে যে শ্রমিক

থাকে, সেই শ্রমিক বা বস্তিবাসী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বর্ণপরিচয়ের ঊর্ধ্বে নয়। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের শৌখিন সীমা পেরুবার পক্ষে তার হাতের কাছে যেটুকু উপাদান বা উপকরণ থাকে, বাঙালি লেখক ছিন্নমূল ব'লেই সেই উপকরণ বা উপাদান ব্যবহারে তৎপর হয়ে ওঠেন না—যেন সমাজের নিচুতলা নিয়ে লেখা যথেষ্ট 'ইন্‌টেলেক্‌চ্যুআল্‌' হয় না!

অন্যপক্ষে সরাসরি রাজনীতি নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয়, অথচ শিক্ষিত বাঙালি কমবেশি রাজনীতি সচেতন। এবং বাঙালি লেখকমাত্রই রাজনীতিকে এড়িয়ে যান না নিশ্চয়। তবু সাহিত্যে বিষয় হিসাবে রাজনীতিকে উপজীব্য করার ক্ষেত্রে এমন উদাসীনতা আশ্চর্যের বই কি তদুপরি যে দু-একজন নামী লেখক—যাঁদের শক্তি অনস্বীকার্য—রাজনীতি নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, সেই উপন্যাসগুলি তাঁরই লেখা অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় নিকৃষ্ট। ঘরে-বাইরে, চার অধ্যায়, পথের দাবী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সশস্ত্র আন্দোলন সম্পর্কে অপরিচয়ই এই জাতীয় উপন্যাসের অসাফল্যের মূল কারণ নয়। বাঙালি মধ্যবিত্তের আজন্ম রোমান্টিকতা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিল ন্যায্য কারণে। তখন অর্থনৈতিক সংকট ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। অন্যদিকে নতুন গড়ে-ওঠা শিল্প মন্দার আঘাতে জর্জরিত। আবার সংসদীয় রাজনীতিতে ভোটদাতার সংখ্যা বাড়ার জন্য বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের হাত থেকে ক্ষমতা দ্রুত চলে যেতে থাকে;[১] ফলে হতাশজর্জর মধ্যবিত্ত মানস ক্রমে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই গণসংগ্রামের পথ পরিহার ক'রে গুপ্ত আন্দোলন ও

১. J. H. Broomfield : *Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century Bengal*, এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

গুপ্ত হত্যার সহজ পথ বেছে নেয় আহত বিক্ষোভ, ক্রোধ চরিতার্থের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র উভয়েই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উৎস, তার জনবিচ্ছিন্নতা অথবা সশস্ত্র আন্দোলন যে সমসাময়িক বাস্তব ব্যাপার তা বেমালুম ভুলে সমস্ত আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য উহ্য রেখে রাজনৈতিক কার্যকলাপ মাত্র কয়েকজন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ রাখেন। অথচ ঐ ধরনের বিষয় নিয়ে ডস্টয়েভস্কি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য প্যজেস্‌ড'; উক্ত উপন্যাসের বক্তব্য বা ডস্টয়েভস্কির সিদ্ধান্ত-সমূহ আমাদের অনেকের কাছে গ্রাহ্য নয় নিশ্চয়। শুধুমাত্র বিপ্লবীদের হেয় করার জন্যই নয়, বিপ্লবের বিরুদ্ধে লিখতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণাও যথেষ্ট স্বচ্ছ ছিল না, যেহেতু তিনি মনে করতেন নিরীশ্বরবাদ ও সমাজতন্ত্র সমার্থক। তবু 'দ্য প্যজেস্‌ড' উপন্যাসে শহরের বিভিন্ন স্তরের মানুষ—অভিজাত, বুদ্ধিজীবী, নিরীশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রেমিক থেকে শুরু ক'রে লম্পট সর্বহারা পর্যন্ত—যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটায়, সেই কাণ্ডে লেখক শারীরিক জীবনের গ্লানি, অবসাদ, নৈরাশ্য সমেত একটা সমগ্র চিত্র তুলে ধরেন। যে-চিত্র অন্তত বুঝতে সাহায্য করে কেন ও কিসের তাড়নায় স্টাবরোজিন, তিখন, স্তেফান ত্রোফমোভিচ্‌, সাটভ, পিতর ভারকোভনস্কি, কিরিলভ এবং লেভিআড্‌কিন্‌ প্রমুখ চরিত্র সর্বদা তেমন আচরণ বা বিশ্বাস করে।

চার অধ্যায় বা পথের দাবী উপন্যাসে এমন চিত্র খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। এসব উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নিজের মনমতো যে ধারণা ক'রে রেখেছেন, তার খাপে খাপে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন পাত্র-পাত্রীদের। ফলে পদে পদে উপন্যাসীয় নিয়মের যথেচ্ছাচার,

লঙ্ঘন হয়েছে। আসলে বাস্তব কারো চাকর নয়, তাকে বাগে আনার জন্য এত প্রয়াস, এবং উপন্যাসের সাফল্য নির্ভর করে বাস্তবকে সঠিক রূপায়ণের উপর। আর বাস্তব পাটিগণিতের সরল অঙ্ক নয়।

এই বাস্তবতার জন্যই রাজতন্ত্রী ব্যালজাক ব্যঙ্গ ও শ্লেষে জর্জরিত করেন তাদের, যাদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম সহানুভূতি। 'ব্যালজাক যে এইভাবে তাঁর নিজের শ্রেণী-সহানুভূতি ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার ·বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন,—তাঁর প্রিয় সামন্তদের পতনের অবশ্যম্ভাবিতা দেখতে পেযেছিলেন এবং তাদের উন্নততর ভাগ্যের অযোগ্য লোক রূপে বর্ণনা করেছিলেন,—তিনি যে ভাবীকালের প্রকৃত লোকগুলিকে দেখতে পেয়েছিলেন এইটাই বাস্তবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জয় এবং ব্যালজাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বলে আমি মনে করি।'[২]

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন ওঠে যে, লেখকের মতামত বা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর রচনার সম্পর্ক কি প্রভু-ভৃত্যের, নাকি তুল্যমূল্য অর্থাৎ সৌহার্দ্যের? একথা সকলের বিদিত যে, লেখক যদি তড়িগড়ি তাঁর মতামত প্রকাশে উদ্যোগী হন, তবে সে-লেখার কপাল মন্দ। হয়ত লেখকের এই দুর্মতির জন্য তাঁর রচনা প্রচার পর্যায়ে নেমে যেতে বাধ্য, এবং প্রচার ও সাহিত্যের পার্থক্য মৌলিক তা বলা বাহুল্য। অন্যপক্ষে লেখায় লেখকের বিশ্বাস কেন্দ্রাভিগ (centripetal) শক্তি, অথচ পাত্র-পাত্রীদের আচার-আচরণ কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তি। লেখক সর্বদা পাত্র-পাত্রীদের তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রে বা তার কাছাকাছি টানতে চান। কিন্তু

২. শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেল্‌স-লেনিন : মার্গারেট হকিন্‌সকে লিখিত এঙ্গেল্‌স-র চিঠি, এপ্রিল ১৮৮৮।

উপন্যাসের নিজস্ব টানে সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীদের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ক্রমে বিকশিত হয়। ফলে পাত্র-পাত্রীরা সর্বদা কর্তার হুকুম মানে না। এই দ্বন্দ্ব সৎ ও মহৎ লেখকের রচনায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। যেহেতু তাঁদের বাস্তব জ্ঞান ও বোধ গড়পরতা লেখকের চাইতে অনেক ব্যাপক ও গভীর, সেহেতু তিনি বাস্তবকে তাঁর মতামতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবেশন করেন না। আর এমন খাপ খাওয়াতে গেলেই লেখা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে স্বাভাবিক কারণে। ফলে যাঁরা সত্যিকারের লেখক, তাঁরা বাস্তবের টানে নিজের মতামতের বিরুদ্ধে যেতে এতটুকু ভীত নন। এঙ্গেল্‌স-এর সেই অমোঘ উক্তি, 'লেখকের মতামত যতই চাপা থাকে শিল্পকৃতির দিক থেকে ততই ভাল। আমি যে বাস্তবতার কথা বলছি, তা—লেখকের মতামত যাই হোক না কেন—তবুও আত্মপ্রকাশ করতে পারে।'[৩]; এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

বাস্তবতার জয়ের জন্যই অনেক-বেশি প্রগতিশীল হয়েও জোলা ব্যালজাকের কাছে হেরে যান। ঠিক একই কাণ্ড ঘটে ডস্টয়েভস্কির ক্ষেত্রে। তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল হলেও তাঁকে খারিজ করা সহজ নয় এজন্য : 'His critism of socialism is pure non-sense ; the world he describes cries out for socialism, however, and for the deliverence of mankind from poverty and humiliation. In his case, too, one must speak of the 'triumph of realism', of the victory of the clear-sighted, realistically-

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে George Lukacs-প্রণীত *Studies in European Realism* (Tr. Edith Bone) পুস্তকটির পৃ ৬-১১ দ্রষ্টব্য।

minded artist over the bewildered, romantic politician.' ।[8]

তাই উপন্যাসের আগে রাজনৈতিক পাবিবারিক যে-বিশেষণই জুড়ে দেওয়া হোক না কেন, উপন্যাসের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে ঔপন্যাসিক নির্বাচন ও সৃজনের মধ্যে বাস্তবকে কতখানি আলোকিত করলেন তার উপর। সেজন্য জীবনবিচ্ছিন্ন হয়ে বা জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে কখনোই সফল উপন্যাস রচনা করা যায় না। আর আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তার সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে সূক্ষ্ম হলেও যে কোনোভাবে, এবং পৃথিবী যতই জটিল হচ্ছে, ততই রাজনীতির খেলা চোখেব অন্তরালের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আজকে উপন্যাস লেখা আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে।

২

একমাত্র 'গোরা' বাদে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ যুগে কোনো ঔপন্যাসিক রাজনীতিকে জীবন-সামগ্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে মনে কবেন নি। গান্ধিজী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের আগে এই উপন্যাসের তাৎপর্য তাই অপরিসীম, কারণ গোরা দেশের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার জন্য শৌখিন বৈঠকখানায় বসে কাল কাটায় নি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা তাকে নিয়ে আসে সাধারণ লোকের কাছে। তার মধ্যে যে উগ্র জাতীয়তাবোধ ছিল, যা সামন্ততান্ত্রিক ধর্ম পুনরুজ্জীবনের অন্য এক রূপ, সেই বিশ্বাস বাইরের ধাক্কায় ভেঙে যেতে থাকে, এবং সে নিজের জীবন দিয়ে

৪. Arnold Hauser : *The Social History of Art*, vol IV, pp 138-139.

বোঝে যে নতুন মানবতাবোধকে সংকীর্ণ হিন্দুয়ানির মধ্যে আটকে রাখা যায় না।

'গোরা' উপন্যাসও অবশ্য উচ্চ মধ্যবিত্তের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের প্রতিক্রিয়ায় রচিত। কারণ তার আগে বঙ্গভঙ্গ-জনিত সরকারী ভেদনীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যার ফলে হিন্দু ভদ্রলোক অনেক কিছু হারাবার ভয়ে ভীত। মুসলমানদের কথা আমাদের লেখকরা কমই ভেবেছেন। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও যে পূরনের প্রয়োজন, সে-কথা আমরা ভাবি নি। বঙ্গভঙ্গ-রদে মুসলিম স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে কিনা, আজ তা বিশদ জানার প্রয়োজন আছে। তাই হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ যখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সেই সময় 'গোরা'-র উপসংহার বাংলাসাহিত্যের ক্ষুদ্র পরিসরে বিপ্লবাত্মক মনে হয়। অথচ এরপর রবীন্দ্রনাথ যেসব উপন্যাস লেখেন, সেসব উপন্যাসে তাঁর বিষয়মুখ দৃষ্টি ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়ে। অবশেষে একটা তত্ত্ব খাড়া ক'রে তিনি সেই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য যা লেখেন, একমাত্র 'চতুরঙ্গ' ছাড়া, তার সব ক-টি প্রতিভার অপমৃত্যুর কথা ঘোষণা করে। যদিও রবীন্দ্রনাথ যেটুকু চেষ্টা করেছিলেন, অন্য ঔপন্যাসিকেরা সেপথ মাড়ান নি তো বটেই, বরং শরৎচন্দ্রীয় তরলতায় অবগাহন ক'রে ভেবেছেন উপন্যাসের মুক্তি ঐ পথে আসবে।

মনে হয় তারাশঙ্কর বহুদিন পর সংগতি রেখে রাজনীতিকে গোটা জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন।[৫] তাঁর উপন্যাসে

৫. সংগতভাবে এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়া উচিত। কিন্তু আমাদের মূল আলোচনা সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসকে নিয়ে, যে-উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে গ্রাম। মানিকবাবুর রাজনৈতিক উপন্যাস মূলত শহর ও শহরতলি-কেন্দ্রিক, তাই তাঁর কথা এখানে বিস্তৃত করা হয় নি।

আন্দোলন-ভিত্তিক রাজনীতি যেমন প্রবেশ করেছে, তেমনি তিনি উপন্যাসের মহাকাব্যিক ধর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলকে উপজীব্য করেন উপন্যাসে। গ্রাম-বাংলা এতদিন কোনো কোনো উপন্যাসে ছিল পটভূমির অজুহাতে, কিন্তু এবার গ্রাম-বাংলা উঠে এল পাত্র-পাত্রীদের রক্তমাংসের সঙ্গে সঙ্গে। তারাশঙ্কর মধ্যবিত্ত হ'লেও শহুরে বুদ্ধিজীবী নন—যদিও তিনি শেষ পর্যায়ে নগরের অধিবাসী—এবং জমির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকায় গ্রাম-বাংলা চিনেছিলেন অনেক গভীরে। তদুপরি গান্ধিজী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অল্পবয়সে, যে-আন্দোলন গ্রামকে স্পর্শ করেছিল বিশেষ কারণে। অথচ সেই আন্দোলন শহুরে-শিক্ষিত গ্রহণ করে নি মনেপ্রাণে। কংগ্রেসী রাজনীতিগ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই ভদ্রলোকদেব চালাকি ছিল। বাঙালি জাত-রোমান্টিক ব'লেই হযত গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন তার মনে তেমন সাড়া জাগায় নি। সেজন্য অসহযোগের মতো ভারত-ব্যাপী আন্দোলন বাঙালি সাহিত্যিককে উদ্বুদ্ধ করেছে নামমাত্র। অথচ সেই আন্দোলনেব অনুপ্রেবণা তারাশঙ্কর কাজে লাগালেন তাঁর উপন্যাসাবলিতে। মানুষের কাছে সহজসরলভাবে যাওয়ার এটা একটা পথ ছিল বই কি। এবং তাবাশঙ্কর তাঁর অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মিশিয়ে লিখলেন একের পব এক উপন্যাস। অবশ্য অসহ-যোগ আন্দোলনকে ছুতো করেই তারাশঙ্কর ক্রমে ক্রমে উপন্যাসোপ-যোগী পটভূমি ও পরিবেশেব সন্ধান পেলেন এবং সেই সূত্রে উপলব্ধি করলেন, নতুন ও পুরনো মূল্যবোধের নিরন্তর সংঘর্ষের কাহিনী লেখার উপজীব্য হওয়া উচিত। বিষয় হিসাবে এই সংঘর্ষের কাহিনী অনবদ্য, এবং তারাশঙ্কর এই বিষয় নির্বাচন করতে পেরেছিলেন তাঁর প্রখর বাস্তবজ্ঞানের জন্য। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু

মূল্যবোধের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে এই সংঘর্ষের স্বরূপ চেনাতে পারল না। তাই তিনি সেখানে যেতে পারলেন না যেখানে গেলে তিনি ভাবীকালের মানুষদের দেখতে পেতেন, 'ইউটোপীয়'ভাবে নয়, বাস্তবই তাঁকে সেখানে নিয়ে যেত। কিন্তু নতুন ও পুরনোর দ্বন্দ্বে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রয়োজন আগামীকে চেনার জন্য, সেই বাস্তবজ্ঞান ও বোধের নিদারুণ অভাবে তিনি সেই ভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘোরেন যেখানে সামন্ততন্ত্র, ধর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদি পথ কেটে রেখেছে মহান ও শাশ্বত ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্মের নামে।

৩

ধর্ম অবশ্যই ভারতের ক্ষেত্রে একটি নিদারুণ বাস্তব ব্যাপার, ধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতকে কল্পনা করা কঠিন। বিখ্যাত মার্কসীঅলজিস্ট স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন, 'When the Indian progressive youth dismisses religion as an opium, he is not only ignoring social facts but the historical process itself by which these have assumed the attached values.'[৬]—তখন আমাদের মতো আনাড়িদের না মেনে উপায় থাকে না যে, ভারতীয় আচার ও সংস্কৃতির উপর ধর্মের প্রভাব অসীম। তাই জনগণের কাছে পৌঁছুবার একটা সহজ রাস্তা হচ্ছে ধর্ম। ভারতীয় জাতীয় অন্দোলনের প্রধান প্রধান নেতারা তা ভোলেন নি, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়কে দলে টানার জন্য এক-একটা হিন্দু উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ও সেই উৎসবকে জাতীয় মর্যাদা দেবার চেষ্টা হয়েছে বার বার।

৬. *Modern Indian Culture : A Sociological Study*, p 7.

ধর্মকে মান্য ক'রে, ধর্মের সাহায্যে জনসাধারণের হৃদয় জয় করার ব্যাপার গান্ধিজী অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝেছিলেন। বিশেষ ক'রে উত্তর ভারতের জনগণের উপর রামায়ণের প্রভাব যে অপরিসীম—একথা তাঁর মতো কেউ এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করে নি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ অংশ নেয়, ফলে স্বাভাবিকভাবে সেই সংগ্রাম ধর্মনিরপেক্ষ হতে বাধ্য। অসহযোগ আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষ হলেও গান্ধিজী সেই আন্দোলনের মর্মে ধর্মের প্রলেপ বুলিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন নি। অবশ্য এর আগেই গণেশ পুজো, শিবাজী উৎসব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তার সূত্রপাত হয়। তবু গণেশ বা শিবাজীর চেয়ে শ্রীরামের আসন অনেক উঁচুতে। তাই গান্ধিজী জনগণের হৃদয় জয় করেন সহজে। অসহযোগ আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ আমাদের ধর্মান্ধ আবেগ ও সংস্কারের কাছে যত সাড়া দিয়েছিল, বুদ্ধির কাছে তত নয়। আর গান্ধিজী তো হৃদয় জয় এবং হৃদয় পরিবর্তন করতেই চেয়েছিলেন। গান্ধিজীর আন্দোলন সে হিসেবে 'নন্-ইন্‌টেলেক্‌চ্যুআল্'। অপিচ এজন্যই বিশেষত সনাতন আবেগপ্রধান আন্দোলন হওয়ায় আমাদের পিছিয়ে-থাকা জনগণ সাড়া দিয়েছিল অসহযোগের ডাকে। গান্ধীজী-প্রবর্তিত আন্দোলন ভারতকে সঠিক না বেঠিক পথে নিয়ে গিয়েছিল—সে বিষয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে। শুধু একটা কথা বলা যায় যে, গান্ধিজীর ডাকে অনেকে সাড়া দিয়েছিল এবং আমরা তাঁকে মানি বা না মানি—এটা ঐতিহাসিক সত্য।

তারাশঙ্করের মতো সতীনাথ ভাদুড়ীও উক্ত আন্দোলনের প্রেরণায় যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে অসহযোগ যথেষ্ট দানা বাধে নি, কিংবা ঐ আন্দোলন সফল হবার পথে অনেক প্রতিবন্ধক ছিল; পক্ষান্তরে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রবাসী বাঙালি, তদুপরি

তিনি বিহারের মধ্যে পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল উত্তর বিহারে বাস করতেন। বিহারে গান্ধিজীর প্রভাব গ্রামের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিহারবাসী গান্ধিজীকে রামচন্দ্রের অবতার ব'লে বা সাক্ষাৎ রামচন্দ্ররূপে জানতেন। এছাড়া রামায়ণের দুর্মর প্রভাবের জন্য 'রামরাজ্য' কথাটি সেখানে জাদুর মতো কাজ করে। সতীনাথ এসব বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনি রামায়ণের আদলে ও দেশের সাধারণ লোকের ধর্মপরায়ণতার কথা ভেবে বৃহত্তর সমাজের কাছে যাওয়ার জন্য 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাস লেখেন, কিংবা ঐ উপন্যাস লিখে তিনি আমাদের সামনে বৃহত্তর জনসমাজকে ফুটিয়ে তোলেন অনবদ্য ভাষায়।

বিহারের রাজনৈতিক চেতনা তখন বাংলাদেশের মতো তীক্ষ্ণ না হলেও বিহারে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যাধিক্য না থাকায় বা ইংরেজি শিক্ষা মধ্যবিত্তদের মনে তেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা না জাগানোয় রাজনীতির প্রভাব শহরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি; আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার বিচারে বিহার তখন বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে ছিল ব'লেই গান্ধিজীর ধর্মসম্পৃক্ত হৃদয়প্রধান অহিংস অসহযোগ আন্দোলন লোকের মনে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। শ্রমিক-আন্দোলন তখনও ভ্রূণ অবস্থায়, অন্যান্য বিক্ষোভও প্রায় অনুপস্থিত। এহেন পরিপ্রেক্ষিতে সে সমাজ গোঁড়ামির বৃত্তে আটকে থাকবে নিশ্চয়। অসহযোগ আন্দোলন সেই বৃত্তের মূলে আঘাত হানে নি, যদিও একটা চাঞ্চল্য তো বটেই। ফলে ত্রেতা যুগের রামরাজ্যের কাল্পনিক চিত্রে জনসাধারণের চোখ আবিল হয়ে থাকলে দোষের কিছু নয়। আর সেই সময় কলিযুগে রামরাজ্য স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিলে সাড়া না জেগে পারে?

সতীনাথ ভাদুড়ীর পক্ষে তাই গান্ধিজীর আন্দোলন নিরক্ষর

সাধারণ লোকের মন কিভাবে বদলাতে পারে—তার ছবি ফুটিয়ে-তোলা সহজ ছিল। কারণ এখানে দেশ বা কাল বা প্রচলিত ধ্যানধারণা—কোনোকিছুর বিপক্ষে তাঁকে যেতে হয় না। সেজন্য যে সমস্ত প্রাথমিক ঝামেলা স্রোতের বিপরীত দিকে গেলে পোয়াতে হয়, সতীনাথ তা নিমেষে কাটিয়ে ওঠেন বিহারের একটি অনুন্নত অঞ্চলের প্রায় আদিম এক সমাজের কয়েকজন মানুষকে অবলম্বন ক'রে।

অনড়, অচল এই সমাজ যদিও একটি নগণ্য শহরের শহরতলিতে অবস্থিত, তবু তাৎমাটুলিকে গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করাও মুস্কিল। উপরন্তু যে কূপমণ্ডুক্য ভারতীয় গ্রামের বৈশিষ্ট্য তাৎমাটুলি তার ব্যতিক্রম নয়। এর অধিবাসীরা 'চাষবাস করে না, বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না। আর বাড়িতে একবেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না।' বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে অথবা পরিচয়ের পথ বন্ধুর, ও যথেষ্ট প্রশস্ত না হ'লে সেই সমাজের লোকজন একান্তভাবে নানা অলৌকিকতা-নির্ভর ও ধর্মে বিশ্বাসী (যে ধর্ম অবশ্য আদিম পর্যায়ের) হবে—এ আর বেশি কথা কি। তাই তাৎমারা মনে করে—'রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন।' এর মধ্যে রোজগারের স্থান সকলের পরে। রামায়ণের প্রভাবই নিশ্চিতভাবে প্রথমে। রামায়ণ এইসব লোকজনের কাছে আহার-বিহারের মতো আবশ্যকীয় ব্যাপার। প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ তাৎমাটুলির সমাজ (স্বয়ংসম্পূর্ণ এই কারণে যে তাৎমাদের 'ঘরামী'র কাজ ও কুয়োর বালি ছাঁকার কাজে খুব দূরে যেতে হয় না, কেবল ধান কাটার সময় মেয়েরা বাইরে যায়), তাই জগদ্দল-সদৃশ। সেজন্য এ সমাজে রোজার বা গুণীর সমাদর, এবং নানা কুসংস্কার (যেমন পাকুড় গাছের গুঁড়ি খাড়া দাঁড়ালে 'বৌকা বাওয়া'র সম্মান বৃদ্ধি, বাড়ির নম্বর দিয়ে লোক গুণে গেলে মৃত্যুর

ভয়, 'বরহম ভূতবাসা' বেলগাছে হুঁকো-কল্কে ঝুলিয়ে দেওয়া) সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে স্বাভাবিক কারণে। তাই এখানেই সম্ভব প্রায় আদিম পঞ্চায়তীর অবাধ প্রতিপত্তি।

এমন সমাজ ও পরিবেশ থেকে জাত একটি ছেলের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে। তাৎমাদের কাছে 'কলস্টর সাহেব'-এর হাওয়া গাড়ি আনাও একটা দারুণ সংবাদ। তাদের সমাজে বাবুলাল অন্য সকলের কাছে মাননীয় এই জন্য যে সে অফিসের চাপরাশি এবং হাকিম হুকুমের সঙ্গে কথা বলে। এর মধ্যে অবশ্য 'হরতাল'-এর কথা দু-একবার শোনা গেলেও তাৎমা সমাজ আধুনিক সভ্যতার অনেক আলোক থেকে বঞ্চিত তা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই সমাজের গায়ে যে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে, সেই পরিবর্তন সর্বদা চাক্ষুষ নয়, এবং সে-পরিবর্তন ঠিক তাদের মতো করেই ব্যাখ্যাত হয়।

পরিবর্তনের প্রথম আভাস পাওয়া যায় 'হরতাল' চালু হবার সময় থেকে। তখন 'সীয়া-রাম-পদ-অঙ্ক' গানে আর ভিক্ষা আদায় করা যায় না, বদলে ঢোঁড়াইকে 'বটোহী' গান রপ্ত করতে হয়। এটা নিশ্চয় একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা। কিন্তু সংগীতের ধরন ও রুচি পাল্টালেও তাৎমাদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য জাগে না। তাই তারা 'গানহী বাওয়ার' আবির্ভাবকে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে। তাদের কাছে যে মাননীয় ব্যক্তি সেই মাস্টার সাহেব যখন তাঁর চেলা হন, তখন তাৎমারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে 'গানহী বাওয়া' রেবন গুণী, বৌকা বাওয়া-র চেয়ে অনেক বড় লোক। আর 'তাৎমাটুলির পঞ্চায়তীতে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, আলবৎ উঁচুদরের সন্ন্যাসী গানহী বাওয়া'।

অর্থাৎ গান্ধিজী এদের মধ্যে মানুষ হিসাবে আসেন না, আসেন

দেবতার সমান হয়ে। তাই এরা 'বিলিতী কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মুরত' আঁকা হয়েছে ব'লে নির্বিচারে বিশ্বাস করে। গান্ধিজী এইসব পিছিয়ে-পড়া লোকদের অন্তরে প্রবেশ করলেও এরা তাঁর আন্দোলনের ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞই থাকে। এবং তিনি অন্যতম অবতার হয়ে আসেন ব'লে তাৎমাদের সমাজে যে আলোড়ন জাগা উচিত ছিল, তা পর্যবসিত হয় শুধু কৌতূহলে। সতীনাথ ভাদুড়ী এখানে অত্যন্ত দক্ষতায় এইসব মানুষের মনের কথা বের ক'রে আনেন।

তাৎমাটুলির লোকেরা লেখকের ভাষায় কথা বলে না, তারা যেন সদ্য সেই সমাজ থেকে উঠে এসেছে—তেমন বিশ্বাস্যতায় সতীনাথ এদের চিত্র তুলে ধরেন। গান্ধিজীর আবির্ভাবে সাড়া না জাগলেও চাঞ্চল্য জাগে ঢোঁড়াই-এর 'পক্কী' মেরামতের দলে কাজ করতে যাওয়ায়। সমাজের প্রচলিত বন্ধন ছিন্ন করার অপরাধ ভয়ঙ্কর, এবং এখানেই লাগে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘর্ষ।

কিন্তু লেখক প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষের বিষয়টি এড়িয়ে যান সচেতনে। সেই সংঘর্ষের কাহিনী তাঁর উপজীব্যও নয়। আর সে কাহিনী রচনার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োজন, তাও তিনি গ্রহণ করেন নি। কারণ 'ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের পাওনা বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে। এর বিবরণ দিতে গেলে, মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিত কিছু কথা না দিয়ে উপায় নাই'।[৭] এজন্য

৭. সতীনাথ ভাদুড়ী : সতীনাথ-বিচিত্রা, পৃ ২১৭।

তিনি সচেতনভাবে নাটকীয় পদ্ধতি এড়িয়ে মহাকাব্যের ঢিলে-ঢালা বিবরণমূলক রীতি গ্রহণ করেন। এ পদ্ধতিতে সমাজের মন্থর পরিবর্তন, চরিত্রদের মানসিক আবর্তনের ইতিহাস যথোপযুক্তভাবে বিবৃত করা চলে। সতীনাথ ভাদুড়ীরও সেই ইচ্ছা ছিল। উপরের উক্তি তার প্রমাণ।

ঢোঁড়াই অচল, অনড়, জরাগ্রস্ত সমাজের অধিবাসী হ'লেও বাইরের হাওয়া তার দেহমনে লাগে। রাস্তা মেরামতের কাজে যোগ দেওয়ায় সে প্রথম বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়। দ্বিতীয় পরিচয় ঘটে গাড়িবলদ কেনার পর। তাই সে তাৎমাদের থেকে ক্রমে ক্রমে আলাদা হয়ে যায়, যদিও তাৎমাটুলিতেও নানা পরিবর্তনের খবর আসে। এবং সে-সমাজও যে পরিবর্তিত হচ্ছে তা বোঝা যায় মহতোর বিলাপে, 'তাৎমাটুলি থেকে লোক চলে যাচ্ছে। বতুয়ার বোনটা মুসলমানের সঙ্গে চলে গেল। হারিয়া মেয়েটার বিয়ে দিয়ে এসেছে, মালদা জেলায়, টাকার লোভে। আর বলছে যে সেইখানে চলে যাবে চাষবাসের কাজ করতে। আমার নিজের ছেলে গুদর সে আরম্ভ করেছে, মুঙ্গেরিয়া তাৎমা রাজমিস্ত্রিদের যোগান দেওয়ার কাজ। সেই হয়ত চলে যাবে মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের গাঁ মারগমায়।…মুঠো থেকে সব পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাকে সে আটকাবে?'

উদ্‌ধৃতির সবগুলি একটা জগদ্দল সমাজ ভেঙে পড়ার ছবি; অন্যপক্ষে বৈপ্লবিক পরিবর্তনেরও ছবি বটে। কিন্তু কোন নিগূঢ় কারণে এই ভাঙন বা পরিবর্তন ঘটে, লেখক তা দেখান নি। সেজন্য ঢোঁড়াইকে যে তাৎমাটুলি থেকে বিদায় নিতে হল, তার কারণ একমাত্র ব্যক্তিগত অভিমান। লেখক এ ছাড়া অন্য কোনো গভীরতর কারণের ইঙ্গিত পর্যন্ত দেন নি। 'আমাদের দেশের

বেশীর ভাগ লোক চাষবাস করে খায়। তাই গরুর-গাড়ি-চালক ঢোঁড়াইকে যৌবনে তাৎমাটুলি থেকে সরাতে হলো চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য।'[৮] বৃহত্তর জনসমাজের কাছে যাওয়ার আকুতি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ঢোঁড়াইকে বৃহত্তর কৃষকসমাজে প্রবেশ করালে উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তার আসে, কিন্তু এই দুই সমাজের (অ-কৃষক তাৎমাটুলির সমাজ ও কৃষিপ্রধান বিসকান্ধার সমাজ) চাপে মানুষ নিশ্চয় একইভাবে পরিবর্তিত হয় না। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্কও সহজ সরল নয়। সমাজ মানুষকে বদলায়, আর সেই পরিবর্তিত মানুষও সমাজকে বদলাতে চায়, হয়ত স্বেচ্ছায়, কখনো অচেতনে।

ঢোঁড়াই অবশ্য রাজনীতি সচেতন হয়েছে, ক্রান্তিদলে যোগও দিয়েছে। পরে তার মোহভঙ্গ হয়েছে। তবু প্রশ্ন জাগে পরিবেশের কোন অসহ চাপে ঢোঁড়াই পরিবর্তিত হল? ঢোঁড়াই অবশ্য নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়, নানা কর্মে চাঞ্চল্যে সে অবশেষে রাজনীতির আবর্তে ঢুকে পড়ে। কিন্তু সেই আবর্তে সে ঢোকে আপন অচেতনে। ক্রান্তিদলে যোগ দেবার সময় তার মন কতখানি প্রস্তুত ছিল তাই পাঠক জানতে পারে না। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ নিলেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে ভেবেচিন্তে এ পথে নামে নি। সেজন্য তার মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগে না। দলের ছোটখাটো ব্যাপার, নেতাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও কলহ এবং একে অপরকে জব্দ করার চেষ্টা, কতিপয় সদস্যের নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা ইত্যাদি যে কোনো সুস্থ লোকের কাছে অসহ্য ঠেকে। পুরোপুরি রাজনীতির লোক হলে ঢোঁড়াই-এর মানসিক প্রতিক্রিয়া আরও জটিল হতো এসব ঘটনায়। কিন্তু তার মন যেন বেরিয়ে

৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২১৯।

পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল প্রায় প্রথম থেকে। উপরন্তু 'ঘোড়ায়-চড়া গরীব হাটুরে, পাটের গাড়ীর গাড়োয়ান' যখন দলের লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে ও দলপতি সব বুঝে না বোঝার ভান করেন, তখন ঢোঁড়াই মনস্থির ক'রে ফেলে। ঠিক এই সময় আবির্ভাব হয় এণ্টনির। 'দৈবানুগ্রহে এন্টির সাক্ষাৎ লাভ'-এ লেখক হয়ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন উপন্যাসের উপসংহার ত্বরান্বিত হবে জেনে। কিন্তু ঐ দৈবানুগ্রহে সাক্ষাৎ লাভ উপন্যাসটির বাঁধন ভেঙে নিমেষে ভাবালুতার খাতে কাহিনী বইয়ে দিলে আমাদের পরিতাপের অন্ত থাকে না।

'মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে' মানুষ ও পরিবেশের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কথা জেনেও লেখক অবশেষে ঢোঁড়াইকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাংলা উপন্যাসের সুপ্রচলিত ধারায় ব্যক্তিগত মান-অভিমানের আবর্তে কাহিনী পরিচালিত করেন। বস্তুত 'রাঁমিয়া কাণ্ড' থেকেই লেখক 'গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরার ইচ্ছা'-র প্রায় সমান্তরালে ঢোঁড়াই-এর একান্ত ব্যক্তিগত মান-অভিমানের চিত্র তুলে ধরেন। অবশ্যই এতে আপত্তির কিছুই থাকে না, যদি সেই ব্যক্তিগত কাহিনী অঙ্গাঙ্গি মিশে থাকে সমগ্রের সঙ্গে। কিন্তু ঢোঁড়াই তাৎমাটুলি ত্যাগ করে অভিমানের বশেই, যদিও তাৎমাটুলি ত্যাগের প্রয়োজন ছিল ঢোঁড়াই-এর ক্রমবিবর্তন দেখানোর জন্য। কিন্তু ভাবালুলতা এমনই এক বস্তু, যা যার মধ্যে প্রবেশ করে তাকেই নষ্ট ক'রে দেয়—রামিয়ার স্মৃতিমন্থনও সেই বিপর্যয় ডেকে আনে এণ্টনির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। তাই যা হয়ে ওঠা উচিত ছিল গ্রামীণ সমাজের একটি প্রতিনিধিমূলক চিত্র, তা অবশেষে পর্যবসিত হয় গ্রামের নানা ধরনের মানুষের খণ্ড খণ্ড অথচ উজ্জ্বল আলেখ্যে।

তাৎমাটুলি সমাজে 'গানহী বাওয়া'-র আবির্ভাব কী মৌলিক পবিবর্তন ঘটালো, তা অজানাই থেকে গেল আমাদের কাছে। এমনকি বিসকান্ধায় যে এত কাণ্ড ঘটে গেল, 'তাৎমাটুলি থেকে অনেক বেশী জটিল' সে সমাজই বা কতটুকু পরিবর্তিত বা আলোড়িত হল গান্ধি-শিষ্যদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বা নানা ঘটনায়? আসলে ঢোঁড়াই নিজে একা বদলে গেলেও, সে একচুলও বদলাতে পারে নি সমাজকে।

হয়ত সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পর-নির্ভরশীলতার কথা ভুলে গিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী ঢোঁড়াই-এর মানসিক বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরতে মনোযোগী ছিলেন, তাই উপন্যাসটিতে ব্যক্তি ও সমাজের চলিষ্ণু সজীব সম্পর্কটি উপেক্ষিত হয়েছে। নাকি গ্রামীণ পরিবর্তন দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না? রামায়ণের রামের মতোই কি ঢোঁড়াই-এর নিঃসঙ্গতার চিত্র ফোটানো তাঁর অনন্য উদ্দেশ্য ছিল? উপসংহারে ঢোঁড়াই-এর নিঃসঙ্গতা তার ইঙ্গিত দিলেও লেখক রামের নিঃসঙ্গতার ট্র্যাজেডি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাম একের পর এক নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, যার প্রতিদানে তাঁর অনেক কিছু পাওয়ার ছিল—অথচ জীবনভোর কেবল দুঃখের বোঝাই বয়ে বেড়ালেন। শেষে একান্ত প্রিয় সীতা-ও তাঁকে পরিত্যাগ করলে তেমন মানুষের জীবন নিশ্চয় সুখকর হয় না। জীবনের ভার বয়ে বয়ে রামচন্দ্রের অভিমান নিছক ব্যক্তিগত স্তরে থাকে না ব'লে তাঁর একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে ঢোঁড়াই-এর কর্মকাণ্ডে বিপুল কর্মের ভার বহনের কোনো ইঙ্গিত নেই। ফলে দলে ঢোকা বা দল ছেড়ে যাওয়ার জন্য তার কোনো আত্মিক বিপর্যয় ঘটে না। সেজন্য তার নিঃসঙ্গতা আমাদের ভাবায় না, অতিনাটকীয় মনে হয় সময় সময়।

আসলে সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তি ও সমাজের, পরিবেশ ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সজীব সম্পর্কের কথা ভুলে যান ব'লে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের প্রথম চরণের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে যে রাজনীতিকে তিনি জীবন সামগ্র্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, সেই রাজনীতি উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে নেহাৎ পটভূমি হয়ে যায়। অথচ এই খণ্ডেই তিনি প্রকৃত লেখকের মতো নিজে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করা সত্ত্বেও সেই রাজনীতি নিয়ে যারা কারবার করে তাদের মুখোশ খুলে ফেলেন বিনাদ্বিধায়, এবং এখানেই তাঁর বিষয়মুখ দৃষ্টি জয়ী হয়।

যতই ভক্তিরসে জারিত করি না কেন রামায়ণ অনস্বীকার্যভাবে একটি রাজনৈতিক মহাকাব্য। যেমন মহাভারতও। রামায়ণের মূল বিষয় ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বে ন্যায়ের জয় বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কেবলই আত্মদান, এবং মূল ঘটনা রাম-রাবণের যুদ্ধ। বাল্মীকি সেই সংঘর্ষের কাহিনী উপজীব্য করলেও নাটকীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। অথচ বিপরীত চরিত্রের স্থাপনায় নানা সংঘাত, দুঃখ, শোকের মধ্যে ঘটনা পরিচালনা করেন ব'লে কাহিনী এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' রামায়ণের আদলে লেখা হলেও ঢোঁড়াই-এর প্রতিপক্ষ হিসাবে কোনো চরিত্র দাঁড় করানো হয় নি। ফলে ঢোঁড়াই কার বিরুদ্ধে লড়ছে, তা অস্পষ্ট থাকে আমাদের কাছে। কোন আবেগ, কিসের তাড়নায় সে গান্ধিজীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ক্রান্তিদলে যোগ দেয়, তার সূত্র তন্ন তন্ন করেও পাওয়া মুশকিল। নিজের দলের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ, অথচ এ দলের লক্ষ্য কী, কাজ কী, লেখক সে-সম্পর্কে নীরব থাকেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা অন্তরালের বিষয় হয় ব'লে ঢোঁড়াই কেবল নিজের ব্যক্তিগত

সমস্যার কথাই চিন্তা করে। তাই গান্ধিজীর নির্দেশমতো সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটি 'প্যাথেটিক' হয়ে ওঠে। কে আর অপরের সুখদুঃখের কথা শুনতে চায়, যদি-না সেই দুঃখসুখে সকলের সুখদুঃখের কারণ নিহিত থাকে? পরের দুঃখে করুণা জাগতে পারে, কিন্তু সেই বিষাদ কি জাগে যা রামায়ণ-মহাভারত পড়ার পর মন ছেয়ে দেয়? অথবা তলস্তয়ের 'কসাক' বা ফর্স্টরের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' পড়লে যেমন স্বদেশপ্রেমের মহিমায় প্রাণ ভরে ওঠে?

আসলে, সতীনাথ ভাদুড়ী মূলত আত্মমুখী লেখক। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ প্রয়োজন ছিল সদাজাগ্রত বিষয়মুখ দৃষ্টিভঙ্গি, যা উপন্যাসের প্রথম চরণে তো বটেই, দ্বিতীয় চরণেও মেলে সময় সময়। তবু 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' পুরোপুরি সফল না হলেও বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি নিশ্চয়। কারণ এই প্রথম মনে হল যেন একজন বাঙালি লেখক পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলের অনুন্নত সম্প্রদায়ের একটি ছেলের কথা ও কর্মের আত্মীয়তা অর্জন করেছেন। ঢোঁড়াই সতীনাথ ভাদুড়ী নয়, সে ঢোঁড়াই-ই। কোনো ভান ক'রে নয়, একেবারে সহজ সরল-ভাবে তিনি তাদের অন্তরের অন্তরে যেতে চেয়েছেন, যা তারাশঙ্করও পারেন নি। কারণ তাঁর সৃষ্ট চরিত্র শিবনাথ, দেবু ঘোষ কেউ-ই মাটির কাছাকাছি যাওয়ার মানুষ হয়ে ওঠে নি। সব চরিত্রই মধ্যবিত্ত মনের অধিকারী ব'লে মনে হয়।

তাই সতীনাথ ভাদুড়ীর দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কথা মনে রেখেও তাঁর খেটে-খাওয়া মানুষদের কাছাকাছি যাওয়ার যে আকূতি, সেই আকূতির বিষয়টি আমাদের অনুধাবনের যোগ্য। দুঃখের বিষয়, সেই সময়কার ও তার পূর্বেকার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একমাত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষক-শ্রমিকদের কথা তীক্ষ্ণভাবে ভেবেছিলেন, এবং তিনিই রাজনীতিকে শুধু পটভূমি হিসাবে নয়, উপকরণ হিসাবে নিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসে। রাজনৈতিক সচেতনতায় বাঙালি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে কয়েক পা এগিয়ে থাকলেও বাংলা উপন্যাসে সেই সচেতনতা প্রতিফলিত হয় নি ব্যাপক ও গভীরভাবে। কয়েকটি উপন্যাস তার ব্যতিক্রম হলেও উক্তিটি অসত্য নয়।

*উৎসাহী পাঠককে শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত সতীনাথ গ্রন্থাবলী দেখতে অনুরোধ করি।